# নিউজ লেটার

৪৫তম বর্ষ: ২য় সংখ্যা
আগস্ট-ডিসেম্বর, ২০২৪ ইং | সফর-জমাদিউস সানি ১৪৪৬ হিজরি
Newsletter
Vol. 45 | Issue: 2 | August-December, 2024

## প্রতিরোধ আন্দোলন অবশ্যই বিজয়ী হবে

- আয়াতুল্লাহ আল উজমা সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী

## দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ন্যানোটেকনোলজি অলিম্পিয়াডে ইরানের স্বর্ণপদক জয়

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ন্যানোটেকনোলজি অলিম্পিয়াডে (আইএনও ২০২৪) স্বর্ণপদক জিতেছে ইরানি দল। মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে ১৭ থেকে ১৮ অক্টোবর অনুষ্ঠিত এই অলিম্পিয়াডে ইরানের প্রতিনিধিত্ব করে ইসফাহান ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি। আইএনও-২০২৪ এ ইরানি দল থাইল্যান্ড, হংকং, তাইওয়ান এবং মালয়েশিয়ার অংশগ্রহণকারীদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রথম স্থান লাভ করে।

## ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান ও উদ্ভাবন মেলায় ইরানের স্বর্ণপদক অর্জন

ইরান ৫ থেকে ১০ নভেম্বর ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান ও উদ্ভাবন মেলা (আইএসআইএফ) ২০২৪-এ পাঁচটি স্বর্ণপদক এবং দুটি বিশেষ পুরস্কার জিতেছে। প্রতিযোগিতায় ২৪টি দেশের ১ হাজার ৯৮০টি দল অংশ নেয়। তারা প্রযুক্তিগত-প্রকৌশল, রসায়ন এবং ন্যানো প্রযুক্তি, বায়োটেকনোলজি এবং পরিবেশ, শক্তি প্রকৌশল, পদার্থবিদ্যা এবং জ্যোতির্বিদ্যা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং প্রযুক্তি, সামাজিক বিজ্ঞান, শিক্ষা এবং শিক্ষাগত প্রযুক্তি সহ আটটি ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

নিউজ লেটার

কালচারাল সেন্টার
ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস ঢাকা -এর বুলেটিন

৪৫তম বর্ষ: ২য় সংখ্যা
আগস্ট-ডিসেম্বর ২০২৪ ইং
সফর-জমাদিউস সানি ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদনা পরিষদের সভাপতি
সাইয়েদ রেজা মীরমোহাম্মদী

সম্পাদনা পরিষদের সদস্য
নূর হোসেন মজিদী
মো. আশিফুর রহমান
মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম
তানজিনা বিনতে নূর

نیوزلتر

فصلنامه رایزنی فرهنگی سفارت ج. ا. ایران در داکا
سال ۴۵، شماره ۲، آوت-دسامبر ۲۰۲۴
مرداد – آذر ۱۴۰۳

مدیر مسئول و سردبیر
سیدرضا میرمحمدی
رایزن فرهنگی
سفارت جمهوری اسلامی ایران در داکا، بنگلادش

اعضای هیئت تحریریه
نور حسین مجیدی
محمد آصف الرحمان
محمد سعید الاسلام
تنجینه بنت نور

ডিজাইন : নোমান শিশির
মুদ্রণ : চৌকস প্রিন্টার্স

# সূচিপত্র

১ সম্পাদকীয় ০২

সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ

২ সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহর শাহাদাত উপলক্ষ্যে ইরানের সর্বোচ্চ নেতার বাণী ০৩
৩ হিযবুল্লাহ ও লেবাননিদের সাহায্য করা মুসলমানদের জন্য ফরজ : ইরানের সর্বোচ্চ নেতা ০৪
৪ আয়াতুল্লাহ আল উজমা সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ীর জুমআর ভাষণ ০৫

আদর্শ

৫ মহানবী (সা.) : বিশ্ব মুসলিমের ঐক্যের অক্ষ- মীর আশরাফ-উল-আলম ১১
৬ হযরত ফাতেমা যাহরা (সা. আ.) : নারীর সর্বোত্তম আদর্শ- শাহনাজ আরফিন ১৫

নির্বাচিত প্রবন্ধ

৭ শহিদ সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহ : ইসলামি প্রতিরোধের পতাকাবাহী- রাশিদুল ইসলাম ১৯
৮ ফিলিস্তিনের আরেক উজ্জ্বল নক্ষত্র শহিদ ইয়াহিয়া সিনওয়ার- খন্দকার মোঃ মাহফুজুল হক ২২
৯ গাজা ও লেবাননে ইহুদিবাদী ইসরাইলি অপরাধযজ্ঞ এবং মুসলিম বিশ্বের দায়িত্ব-কর্তব্য- অধ্যক্ষ মুহাম্মদ শওকাত হোসেন ২৬
১০ শহিদ কাসেম সোলায়মানী : পশ্চিম এশিয়ায় মার্কিন চক্রান্ত নস্যাতের মহানায়ক- নূর হোসেন মজিদী ২৯
১২ সুফিবাদের উৎস সন্ধান ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত- ড. সাইফুল ইসলাম খান ৩৩

সাহিত্য-সংস্কৃতি

১৩ নজরুলের কাব্যচেতনায় হাফিজের প্রভাব- ড. আবদুস সবুর খান ৩৭
১৪ জালাল উদ্দিন রুমির কবিতায় অধ্যাত্মপ্রেম ও মূল্যবোধ- ড. মো. কামাল উদ্দিন ৪৪
১৫ পারভীন এতেসামি : মানবতার কবি জীবনী, সাহিত্যকর্ম এবং তাঁর সম্পর্কে মনীষীদের মন্তব্য- রাহেলা আক্তার ৪৮
১৬ ফিলিস্তিন বিষয়ক কবিতা ৫২

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

১৭ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনে ইরানের সাফল্য- সাইদুল ইসলাম ৫৪

ইরানি চলচ্চিত্র

১৮ ইরান : চলচ্চিত্র দুনিয়ার টেস্ট অফ চেরি!- ড. মুমিত আল রশিদ ৬১

সভা সমাবেশ

১৯ ঢাকায় 'পয়েট্রি ফর ফিলিস্তিন' শীর্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত ৬৩
২০ ঢাকায় পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) ও ঐক্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত ৬৫
২১ ঢাকায় 'হাফিজের প্রেরণায় নজরুল' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত ৬৮
২২ ঢাবির ফারসি বিভাগের নবীন বরণ ও বিদায় সংবর্ধনা ৭০
২৩ ঢাকার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনদিনব্যাপী ইরানি চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত ৭১

কালচারাল সেন্টার
ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, ঢাকা, বাংলাদেশ
বাড়ি নং-৭, রোড নং-১১ (পুরানো ৩২), ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯। ফোন : +৮৮০-২-৪১০২০৪২১-২৪
E-mail : dhaka.icro@gmail.com

# সম্পাদকীয়

নিউজলেটারের এই সংখ্যার বিষয়গুলো যখন তৈরি করা হচ্ছিল, সেই দিনগুলোতে বিশ্বে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। বিশেষ করে পশ্চিম এশিয়ার ফিলিস্তিন ও লেবাননে সংঘটিত বিভিন্ন বিষয় ও পরিবর্তনের ফলে এমন কিছু তিক্ত ও দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে, যা প্রতিটি মুসলিম, এমনকি প্রতিটি অমুসলিমের হৃদয়কে  ব্যথিত ও আহত করেছে। ইহুদিবাদী শাসকগোষ্ঠী গাজা ও ফিলিস্তিনের জনগণের বিরুদ্ধে তাদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডকে তীব্রতর করছে এবং ইসলামি আন্দোলন হামাসের নেতা ইসমাইল হানিয়াহকে শহিদ করেছে। এসব অপরাধের ধারাবাহিকতার মধ্যেই ইসরাইল দক্ষিণ লেবাননে আক্রমণ ও আগ্রাসন চালায় এবং লেবাননের হিযবুল্লাহ আন্দোলনের সাহসী ও জনপ্রিয় নেতা সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহকেও শহিদ করে।

যদিও আজ জেরুজালেমের দখলদারী শাসকগোষ্ঠীর নৃশংসতা বিশ্বের সকল দেশে জনতার প্রতিবাদ ও নিন্দার সম্মুখীন হচ্ছে, এই অপরাধের প্রতিবাদে বিভিন্ন দেশের নাগরিকরা, এমনকি ইউরোপ ও আমেরিকার সাধারণ জনগণ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও রাস্তায় নেমে আসে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সংগঠনগুলো, বিশেষ করে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ পশ্চিমা শক্তির প্রভাবের কারণে এই অপরাধগুলো প্রতিরোধে তাদের সত্তাগত দায়িত্ব পালন করেনি। অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের দখলদারিত্ব ও ফিলিস্তিন ইস্যুতে নিরাপত্তা পরিষদের আচরণ ও কর্মকাণ্ড নিঃসন্দেহে জাতিসংঘ সনদের পরিপন্থী। এই সংস্থাটি তার কর্তব্য অর্থাৎ পশ্চিম এশিয়ার নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করতে কেবল ব্যর্থই নয়, বরং এই পরিষদের তিনটি স্থায়ী সদস্য দেশের পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ ও পৃষ্ঠপোষকতার কারণে যায়নবাদী শাসকদের স্পর্ধা আরো বেড়ে গিয়েছে। আজ পাশ্চাত্য ফিলিস্তিন ও লেবাননের জনগণের বিরুদ্ধে ইসরাইলের হত্যাকাণ্ড এবং মানবতাবাদী অপরাধকে প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে।

এমতাবস্থায় ফিলিস্তিন ও লেবাননের নিপীড়িত জনগণকে রক্ষা করা ও তাদের সমর্থনে দাঁড়ানো সকল মুসলিম ও ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য কর্তব্যস্বরূপ, তাই যে কোনো সম্ভাব্য উপায়ে তাদেরকে সাহায্য ও সমর্থন করা সকলের নৈতিক দায়িত্ব। ফিলিস্তিন ও লেবাননে যা ঘটছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে আজ মুসলমানদের জন্য, এমনকি বিশ্ব মানবতার জন্য একটি পরীক্ষার দিন এবং আগামীকাল ইতিহাস এর বিচার করবে।

এই ইস্যুটির গুরুত্বের কারণে নিউজলেটারের এবারের সংখ্যায় প্রকাশনাটির বিষয়বস্তুর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ফিলিস্তিন ও লেবানন ইস্যুতে উৎসর্গ করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে আমরা ইসলামি ভূখণ্ডের এই অংশের নির্যাতিত জনগণকে সমর্থন করার যে দায়িত্ব তা পালন করেছি। ইহুদিবাদী শাসকগোষ্ঠীর কবল থেকে ফিলিস্তিনিদের অধিকৃত ভূমি মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এবং যায়নবাদী এই শাসকগোষ্ঠীর মানবতাবিরোধী অপরাধের অবসান না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বের সকল মুসলিম ও স্বাধীন মানুষ ফিলিস্তিন ও লেবাননের নির্যাতিতদের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখবে বলে আশা রাখছি।

এই বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে, (আমি এটা জরুরি মনে করি) নিউজলেটার ম্যাগাজিনের আগের সংখ্যার পাঠক, যাঁরা বেশ কয়েক বছর বিরতির পরে এই প্রকাশনাটির পুনঃপ্রকাশের বিষয়ে এবং বিগত সংখ্যার বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাঁদের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ বাংলাদেশস্থ ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাসের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে জানিয়েছেন তাঁদের প্রতি আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

**সাইয়্যেদ রেজা মীরমোহাম্মদী**
কালচারাল কাউন্সেলর, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, বাংলাদেশ

# সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহর শাহাদাত উপলক্ষ্যে ইরানের সর্বোচ্চ নেতার বাণী

লেবাননের ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন হিযবুল্লাহর মহাসচিব সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহর শাহাদাতের খবর নিশ্চিত হওয়ার পর ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এক শোকবাণী দিয়েছেন ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহিল উজমা খামেনেয়ী। বাণীতে তিনি বলেছেন, তাঁর শাহাদাতের ফলে প্রতিরোধ ফ্রন্ট দুর্বল হয়ে যাবে না, বরং ইহুদিবাদী ইসরাইলের পতনোন্মুখ ও ক্ষয়িষ্ণু দেহে প্রতিরোধ ফ্রন্টের আঘাত আরো কঠোর হবে।

২৭ সেপ্টেম্বর রাতে লেবাননের রাজধানী বৈরুতের দক্ষিণ উপকণ্ঠে ইহুদিবাদী ইসরাইলি আগ্রাসী বাহিনীর ভয়াবহ বিমান হামলায় সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহ শাহাদাতবরণ করেন।

ইরানের সর্বোচ্চ নেতার শোকবাণীটি হুবহু তুলে ধরা হলো:

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম,

ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন,

মহান ইরানি জাতি,

মহান মুসলিম উম্মাহ,

মহান মুজাহিদ, পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলে প্রতিরোধ যুদ্ধের ঝাণ্ডাবাহক, প্রজ্ঞাবান ধর্মীয় আলেম এবং ধীশক্তিসম্পন্ন রাজনৈতিক নেতা সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহ রেজওয়ানুল্লাহ আলাইহ লেবাননের শুক্রবার রাতের ঘটনায় শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেছেন এবং ঊর্ধ্বজগতে গমন করেছেন। প্রতিরোধ ফ্রন্টের এই সম্মানিত নেতা আল্লাহর রাস্তায় কয়েক দশকের জিহাদ ও কষ্টসাধ্য পরিশ্রমের ফল একটি পবিত্র যুদ্ধে লাভ করলেন। তিনি এমন সময় শহিদ হন যখন বৈরুতের উপকণ্ঠে বসবাসরত নিরস্ত্র ও অসহায় মানুষগুলোকে কীভাবে রক্ষা করা যায়, তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘরবাড়িগুলোর কী করা যায় এবং তাদের হতাহত প্রিয়জনদের কীভাবে দাফন-কাফন করা যায় সে ব্যাপারে পরিকল্পনা ও পরামর্শ করছিলেন। গত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি ইসরাইলবিরোধী যুদ্ধের পাশাপাশি নির্যাতিত ফিলিস্তিনি জনগণকে রক্ষা করা, তাদের বেদখল হয়ে যাওয়া শহর ও গ্রামগুলো পুনরুদ্ধার করা এবং গণহত্যার শিকার পরিবারগুলোকে সহায়তা করার কাজে সময় ব্যয় করেছেন। এমন সব মহান কাজের প্রতিদানে শাহাদাতের মর্যাদা ছিল তাঁর অবশ্যম্ভাবী প্রাপ্য।

সাইয়্যেদ নাসরুল্লাহর শাহাদাতের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্ব একজন মহান ব্যক্তিত্বকে, প্রতিরোধ ফ্রন্ট তার প্রখ্যাত ঝাণ্ডাবাহককে এবং হিযবুল্লাহ তাদের অনন্য নেতাকে হারিয়েছে; কিন্তু তিনি কয়েক দশকের যে জিহাদি চেতনা ও ফসল রেখে গিয়েছেন তা কখনও হারিয়ে যাবে না। তিনি লেবাননে প্রতিরোধ আন্দোলনের যে ভিত্তি স্থাপন করেছেন এবং প্রতিরোধের অন্যান্য ফ্রন্টে যে প্রেরণা ছড়িয়ে দিয়েছেন তা তাঁর অনুপস্থিতিতে স্তিমিত হয়ে যাবে না, বরং তিনিসহ বৈরুতের ঘটনায় অন্যান্য শহিদের রক্তের বদৌলতে আরো বেশি শক্তিশালী ও দৃঢ় হবে। মহান আল্লাহর অশেষ ইচ্ছায় ইহুদিবাদী ইসরাইলের পতনোন্মুখ ও ক্ষয়িষ্ণু দেহে প্রতিরোধ ফ্রন্টের আঘাত আরো কঠোর হবে। মনে রাখতে হবে, বৈরুতে হামলার ঘটনায় ইহুদিবাদী ইসরাইলের অপবিত্র অস্তিত্ব বিজয়ী হতে পারেনি।

প্রতিরোধ ফ্রন্টের এই মহান নেতা কোনো একক ব্যক্তিত্ব ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন একটি আদর্শ, একটি গতিপথ; এই পথচলা অব্যাহত থাকবে। শহিদ সাইয়্যেদ আব্বাস মুসাভির [হিযবুল্লাহর সাবেক নেতা] রক্ত বৃথা যায়নি, শহিদ সাইয়্যেদ হাসানের রক্তও বৃথা যাবে না।

আমি প্রিয় সাইয়্যেদের সম্মানিত স্ত্রী, যিনি এর আগে আল্লাহর রাস্তায় নিজের সন্তান সাইয়্যেদ হাদিকে হারিয়েছেন তাঁকে এবং তাঁর অন্যান্য সন্তানকে শুভেচ্ছা ও সমবেদনা জানাচ্ছি। সেই সঙ্গে সমবেদনা জানাচ্ছি বৈরুতের এই ঘটনায় অন্যান্য শহিদের পরিবারবর্গের প্রতিও। আমি হিযবুল্লাহর প্রতিটি সদস্য, লেবাননের সম্মানিত জনগণ ও সরকার, প্রতিরোধ ফ্রন্টের সকল যোদ্ধা এবং সার্বিকভাবে গোটা মুসলিম উম্মাহকে সাইয়্যেদ নাসরুল্লাহর শাহাদাতে শুভেচ্ছা ও সমবেদনা জানাচ্ছি। আমি ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানে পাঁচদিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করছি। মহান আল্লাহর দরবারে এই দরখাস্ত পেশ করছি, তিনি যেন বৈরুতের শহিদদেরকে তাঁর প্রিয়ভাজনদের দলে অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

আল্লাহ তাআলার সৎকর্মশীল বান্দাদের প্রতি সালাম।

**সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী**

২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

# হিযবুল্লাহ ও লেবাননিদের সাহায্য করা মুসলমানদের জন্য ফরজ : ইরানের সর্বোচ্চ নেতা

লেবাননের সাম্প্রতিক ঘটনা-প্রবাহ সম্পর্কে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা হযরত আয়াতুল্লাহিল উজমা ইমাম খামেনেয়ী গুরুত্বপূর্ণ বাণী দিয়েছেন। তাঁর এই বাণী এখানে তুলে ধরা হলো:

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম (পরম করুণাময় ও অসীম দাতা মহান আল্লাহর নামে শুরু করছি)

লেবাননের প্রতিরক্ষাহীন বেসামরিক জনগণের উপর হত্যাযজ্ঞ ইহুদিবাদী ইসরাইলের উন্মাদ কুকুরদের পাশবিক চরিত্রকে আবারও সবার কাছে স্পষ্ট করেছে।

অন্যদিকে এসব হত্যাযজ্ঞ বা গণহত্যা দখলদার ইহুদিবাদী শাসকদের সংকীর্ণ দৃষ্টি ও নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ নীতিরও প্রমাণ তুলে ধরেছে। ইহুদিবাদী শাসকগোষ্ঠীর সন্ত্রাসী-ঘাতক চক্র গাজায় এক বছর ধরে অপরাধযজ্ঞে ভরপুর যুদ্ধ থেকে শিক্ষা নেয়নি এবং এটা বুঝতে সক্ষম হয়নি যে, বেসামরিক নারী, শিশু ও জনগণের উপর গণহত্যা চালিয়ে প্রতিরোধের সুদৃঢ় কাঠামোর উপর কোনো প্রভাব ফেলা যায় না এবং একে অকেজো করা যায় না।

(ফাইল ফটো) ইরানের সর্বোচ্চ নেতার সাথে সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহর সাক্ষাৎ

তারা এখন ওই একই বোকামিপূর্ণ নীতি পরীক্ষা করছে লেবাননে। ইহুদিবাদী অপরাধীরা জেনে রাখুক তারা লেবাননের ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন হিযবুল্লাহর দুর্ভেদ্য কাঠামোর উপর বড় ধরনের কোনো আঘাত হানার মতো শক্তিমান হওয়ার চেয়ে অনেক দুর্বল অবস্থায় রয়েছে। এ অঞ্চলের প্রতিরোধের সমস্ত শক্তি হিযবুল্লাহর পাশে রয়েছে এবং এর পৃষ্ঠপোষকতা করছে। এ অঞ্চলের ভাগ্য নির্ধারণ করবে প্রতিরোধ-বাহিনীগুলো এবং এর অগ্রভাগে রয়েছে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো হিযবুল্লাহ।

লেবাননের জনগণ এটা ভুলে যায়নি যে, এক সময় দখলদার ইসরাইলি সেনারা বৈরুত অঞ্চলকেও তাদের বুট-জুতার তলায় রেখেছিল, আর এই হিযবুল্লাহই তাদের পা কেটে দিয়েছিল এবং লেবাননকে গৌরব ও মর্যাদায় মহামহিম করেছিল। আজও লেবানন মহান আল্লাহর শক্তি ও সহায়তায় আগ্রাসী, নাপাক বা খবিস ও কলঙ্কিত শত্রুকে অনুতপ্ত করবে।

নিজেদের সব শক্তি ও উপায়-উপকরণ নিয়ে লেবাননের গৌরবান্বিত হিযবুল্লাহ ও দেশটির জনগণের পাশে দাঁড়ানো এবং দখলদার, জালিম ও খবিস এই শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘাতে তাঁদেরকে সাহায্য করা সব মুসলমানের জন্য অবশ্য-পালনীয় কর্তব্য বা ফরজ।

মহান আল্লাহর সব সৎকর্মশীল বান্দার প্রতি সালাম।

**সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী**

২৪ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

# আয়াতুল্লাহ আল উজমা সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ীর জুমআর ভাষণ

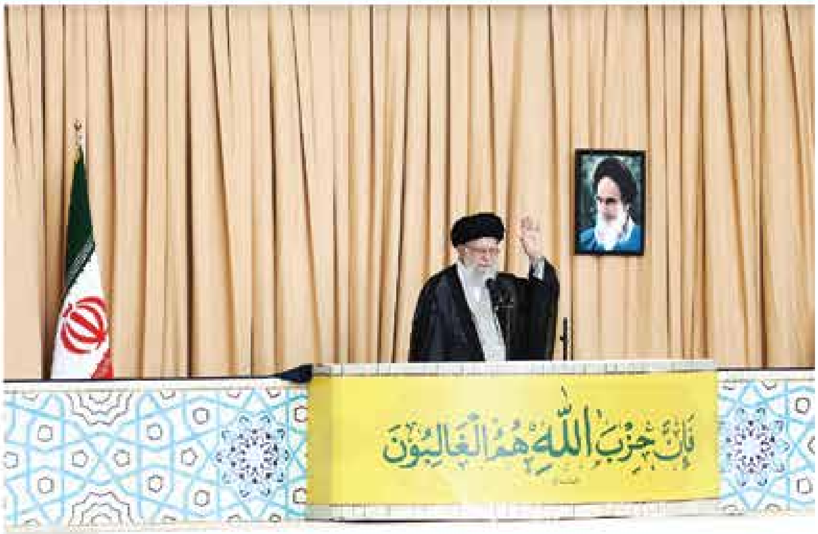


আল আকসা তুফানের এক বছর পূর্তি লগ্ন এবং বায়তুল মুকাদ্দাস ও ফিলিস্তিন মুক্তি এবং প্রতিরোধ আন্দোলনের অগ্রদূত মজলুম শহিদ হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহর শাহাদাত উপলক্ষে ইসলামি বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আল উজমা আলী খামেনেয়ী গত ৪ অক্টোবর, ২০২৪ তেহরানের ইমাম খোমেইনী মোসাল্লায় জুমআর নামাজ পড়ান এবং লাখো মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই নামাজের পূর্বে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। এই ঐতিহাসিক ভাষণের বাংলা অনুবাদ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

**প্রথম খুতবা**

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন। সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। অতঃপর আমাদের নেতা ও নবি আবুল কাসিম মুস্তাফা মুহাম্মাদ ও তাঁর মনোনীত পবিত্র বংশধরদের, বিশেষ করে পৃথিবীর উপর আল্লাহর বিদ্যমান প্রতিনিধি ইমাম মাহদী (আ.)-এর উপর দরুদ ও সালাম পেশ করছি। হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসা করছি, আপনার কাছেই সাহায্য চাচ্ছি, আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার উপরই নির্ভর করছি। আর সালাম প্রেরণ করছি মুসলমানদের আল্লাহ মনোনীত নেতাদের প্রতি যাঁরা মুস্তাদ্‌আফীন (দুর্বল ও অসহায়) মানুষদের পৃষ্ঠপোষক এবং মুমিনদের পথপ্রদর্শক।

মহান আল্লাহ বলেছেন, 'মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের অভিভাবক; তারা মানুষকে সৎকর্মের আদেশ দেয় এবং অসৎকর্ম হতে নিবৃত্ত করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, এরা সেসব লোক যাদেরকে আল্লাহ অনতিবিলম্বে করুণা করবেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' (সূরা তাওবা : ৭১)

প্রিয় ভাই ও বোনদের এবং আমার নিজেকে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বনের (আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষার জন্য আত্মসংযমের) আহ্বান জানাচ্ছি। তাকওয়ার অর্থ হলো আমরা যেন আমাদের কথা ও কাজে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা মেনে চলি।

**মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কুরআনের নির্দেশিত নীতি**

আমি প্রথমেই আপনাদের সামনে যে আয়াতটি পাঠ করেছি তাতে মুমিনদের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি নীতি বর্ণিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনের ভাষায় পারস্পরিক এই সম্পর্ককে 'বেলায়াত' বলে অভিহিত করা হয়েছে অর্থাৎ মুমিনদের পারস্পরিক 'অভিভাবকত্বের সম্পর্ক'। এ বিষয়টি পবিত্র কুরআনের কয়েক স্থানে উল্লিখিত হয়েছে।

এ আয়াতে মুমিনদের এ পারস্পরিক 'বেলায়াত' ও অভিভাবকত্বের

সম্পর্কের ফল আল্লাহর রহমত ও করুণার কথা বলা হয়েছে। 'এরাই হলো তারা যাদের প্রতি আল্লাহ রহমত করবেন'– এ কথার অর্থ হলো : হে মুসলমানরা, তোমরা যদি পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও সহমর্মিতা বজায় রাখ এবং পরস্পরকে সহযোগিতা কর তবে আল্লাহর রহমতের শামিল হবে। অতঃপর বলছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' তিনি আয়াতের শেষে তাঁর পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান হওয়ার বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এ আয়াতে এমন এক রহমতের কথা বলা হয়েছে যা তাঁর পরাক্রম ও প্রজ্ঞার সাথে সামঞ্জস্যশীল। যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ রহমত ও করুণার ধরন অসংখ্য এবং তাঁর সকল নিয়ামত ও অনুগ্রহকে–যা মানুষের সমগ্র জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে–অন্তর্ভুক্ত করে সেহেতু আলাদাভাবে আল্লাহর বিশেষ এ দুই গুণ ও বৈশিষ্ট্য–পরাক্রম ও প্রজ্ঞা–উল্লেখ করে তিনি সেগুলোর সাথে সঙ্গতিশীল রহমতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। 'আল্লাহর পরাক্রম' অর্থ তাঁর ক্ষমতার যে আধিপত্য সমগ্র বিশ্বকে বেষ্টন করে রেখেছে আর 'আল্লাহর প্রজ্ঞা' অর্থ তাঁর সমগ্র সৃষ্টি যে পদ্ধতি ও নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত তা সুদৃঢ় ও অটল। হয়ত আল্লাহ এ আয়াতের মাধ্যমে যে বিষয়টির প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করাতে চেয়েছেন তা হলো যদি মুসলমানরা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ থাকি তবে আল্লাহর পরাক্রম ও প্রজ্ঞা তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় থাকবে। ফলে তারা আল্লাহর অসীম ক্ষমতা এবং তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ ঐশী নীতি ও পরিচালনা ব্যবস্থা দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।

এখন প্রশ্ন হলো এই 'বেলায়াতের' বিষয়টি কী? বেলায়াত হলো মুসলমানদের পারস্পরিক অবিচ্ছেদ্য ও সুদৃঢ় সম্পর্ক। এটাই হলো কুরআনের দৃষ্টিতে মুসলমানদের সম্পর্কের নীতি। মুসলমানদের জন্য কুরআনের নির্দেশিত রাজনৈতিক নীতি হলো মুসলমানদের বিভিন্ন দল, জাতি ও গোষ্ঠী পরস্পর ঐক্যবদ্ধ থাকবে। এ আয়াতটি যেন আমাদের এ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে, যদি মুসলমানরা সকলে ঐক্যবদ্ধ থাকে তবে আল্লাহর পরাক্রম ও অপরাভব ক্ষমতা তাদের সহায়ক হবে। ফলে তারা সকল প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে সকল শত্রুর উপর বিজয়ী হবে। আল্লাহর প্রজ্ঞাও তোমাদের সাহায্যকারী হবে অর্থাৎ আল্লাহর বিশ্বব্যবস্থায় প্রবর্তিত নীতি ও প্রাকৃতিক কানুনগুলো তোমাদের লক্ষ্য অর্জনের পথকে সুগম করবে ও তোমাদের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করবে। এটাই হলো কুরআনের যুক্তি, পথ ও নীতি।

## মুসলমানদের ব্যাপারে শত্রুদের গৃহীত নীতি

আর এর বিপরীতে মুসলমানদের শত্রুদের অর্থাৎ বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী ও আগ্রাসী শক্তির দেশগুলোর নীতি হলো মুসলমানদের মধ্যে 'বিভক্তি সৃষ্টি কর, অতঃপর (তাদের উপর) শাসন কর'। ইসলামি ভূখণ্ডে তাদের অনুপ্রবেশের সহজ পথ হলো উম্মাহর বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী, গোত্র ও মাজহাবগুলোর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা। তারা মুসলিম দেশগুলোতে বিভিন্নভাবে এ কাজটি করে থাকে এবং এখনও তা অব্যাহত রেখেছে। তারা চায় মুসলিম উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত জাতিগুলোর মানুষেরা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষী মনোভাব লালন করুক। কিন্তু এখন মুসলমানরা অনেক সচেতন হয়েছে। সুতরাং মুসলমানরা চাইলে শত্রুদের এ প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দিতে পারে।

আমি বলতে চাই, ফিলিস্তিন জাতির শত্রুই হলো আমাদের ইরানি জাতির শত্রু। তারাই হলো লেবানন, ইরাক, মিশর, সিরিয়া ও ইয়েমেনের শত্রু। আমাদের সবার শত্রু এক। তবে আমাদের

প্রত্যেকের সাথে তাদের শত্রুতার ধরন দেশ ভেদে ভিন্ন। কারো বিরুদ্ধে তারা মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ চালায়, কারো উপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, কারো উপর তারা সামরিক অভিযান চালায় ও দুই টন ওজনের বোমা ফেলে। কারো বিরুদ্ধে অস্ত্র ব্যবহার করে আবার কারো বিরুদ্ধে কূটনৈতিক কৌশল অবলম্বন করে (বাহ্যিক সুসম্পর্কের ভাব দেখিয়ে পেছন থেকে ছুরিকাঘাত করে)। শত্রুদের সকল নির্দেশ একটি কেন্দ্র থেকে দেওয়া হয়। ঐ কেন্দ্র থেকে যখন নির্দেশ আসে 'অমুক মুসলিম দেশে আক্রমণ কর', তখন তারা সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যদি এতে সফল হয় তবে একই পরিকল্পনা অন্য আরেক মুসলিম দেশে বাস্তবায়ন করার পদক্ষেপ নেয়। সুতরাং আমাদের মুসলিম উম্মাহকে সচেতন হতে হবে যেন তারা এরকম করতে না পারে।

যে জাতিই শত্রুর ধ্বংসকারী এ প্রচেষ্টা থেকে বাঁচতে চায় তাকে সজাগ থাকতে হবে। যদি তারা দেখে অন্য একটি দেশের উপর শত্রুরা আগ্রাসন চালিয়েছে তখন তাদের উচিত হবে ঐ মজলুম জাতির পাশে দাঁড়ানো এবং তাকে সহযোগিতা করা যেন শত্রু তাদের উপর সফল না হতে পারে। কারণ, শত্রু সেখানে সফল হলে আরেক দেশের দিকে দৃষ্টি দেবে। আমরা মুসলমানরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এ বিষয়ে উদাসীন রয়েছি। এর পরিণতিও ভোগ করেছি। তাই আর অবহেলা করার সুযোগ নেই। আমাদের সচেতন থাকতে হবে। আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহকে শক্তিশালী করতে হবে, আমাদের মধ্যে স্বাধীনতা সংরক্ষণের অনুপ্রেরণা উজ্জীবিত রাখতে হবে, আত্মসম্মানবোধকে জাগ্রত রাখতে হবে। আফগানিস্তান থেকে ইয়েমেন এবং ইরান থেকে ফিলিস্তিন ও লেবানন পর্যন্ত সুরক্ষিত রাখতে হবে। সকল ইসলামি রাষ্ট্র ও তাদের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। তবেই আমরা শত্রুর থেকে নিরাপদ থাকব।

আজকে আমার বক্তব্যের বড় অংশটি ফিলিস্তিন ও লেবাননের ভাইদের উদ্দেশ্যে যারা বর্তমানে সমস্যায় আক্রান্ত। দ্বিতীয় খুতবায় তাদের উদ্দেশে কিছু বলব ইনশাআল্লাহ।

মুসলমানদের ঐক্যের বিষয়টির পর দ্বিতীয় যে বিষয়টির প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হলো ইসলামের প্রতিরক্ষা নীতি। ইসলাম এ ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় দায়িত্বকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। ইসলামের প্রতিরক্ষার বিধানটি যেমন আমাদের সংবিধানে বর্ণিত হয়েছে তেমনি আন্তর্জাতিক আইনেও তা বৈধ বলে স্বীকৃত। আন্তর্জাতিক যে প্রতিরক্ষা আইন তৈরিতে আমাদের কোনো ভূমিকাই ছিল না তাতেও সকলের জন্য এ অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। আর তা হলো যে কোনো জাতিরই অধিকার রয়েছে তার ভূখণ্ড, দেশ, সীমারেখা ও জাতীয় স্বার্থরক্ষায় আগ্রাসী শত্রুকে প্রতিরোধ করতে পারবে। এ কথার অর্থ হলো, ফিলিস্তিন জাতির অধিকার আছে, যে শত্রু তার ভূমি ও গৃহকে দখল করেছে, তাদের কৃষিজমিগুলোকে ধ্বংস করেছে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার এবং স্বীয় ভূখণ্ডকে দখলদারদের থেকে মুক্ত করার। সুতরাং ফিলিস্তিনিদের এ অধিকার একটি যৌক্তিক অধিকার– আন্তর্জাতিক আইনেও যেটাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

ফিলিস্তিনের প্রকৃত মালিক কারা? ফিলিস্তিনের প্রকৃত অধিবাসী কারা? এই দখলদাররা কোথা থেকে এসেছে? ফিলিস্তিন জাতির অধিকার রয়েছে এই দখলদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও প্রতিরোধ করার। আন্তর্জাতিক কোনো আদালত, আন্তর্জাতিক কোনো সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানেরই ফিলিস্তিন জাতির এ কাজের প্রতিবাদ করার

অধিকার নেই। তাদের কারো এ কথা বলার অধিকার নেই যে, কেন যায়নবাদী ইহুদিদের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিরা যুদ্ধ করছে? আর যারা ফিলিস্তিন জাতিকে সাহায্য করছে তারা তাদের দায়িত্ব পালন করছে। আন্তর্জাতিক কোনো আইনের ভিত্তিতেই কেউ এ প্রশ্ন করার ও প্রতিবাদের অধিকার রাখে না যে, কেন হিযবুল্লাহ ও লেবাননের অধিবাসীরা ফিলিস্তিনিদের বিপ্লবকে ও গাজার মানুষদেরকে সাহায্য করছে? কারণ, এটা তাদের দায়িত্ব। তাই তারা তাদের দায়িত্ব পালন করছে। এটা যেমন ইসলামের বিধান, তেমনি বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি এবং একটি বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আইন। ফিলিস্তিনিরা তাদের ভূখণ্ড উদ্ধার ও রক্ষায় যুদ্ধ করছে। তাই তাদের প্রতিরক্ষা যুদ্ধ যেমন বৈধ; তাদেরকে সাহায্য করাও বৈধ।

এটা একটি যৌক্তিক পদক্ষেপ। সুতরাং হামাস ও হিযবুল্লাহর দ্বারা পরিচালিত এসব আক্রমণ বিশেষত গত বছরে এরকম সময়ে

ইসরাইলের বিরুদ্ধে 'তুফানুল আকসা' নামক যে হামলা চালানো হয়েছে তা আন্তর্জাতিক আইনে বৈধ এক প্রতিরক্ষা এবং ফিলিস্তিনিদের এটা করার ন্যায়সঙ্গত অধিকার ছিল। লেবাননিরা ফিলিস্তিনের মজলুম মানুষদের রক্ষায় যে জান-প্রাণ দিয়ে লড়ছেন তাও প্রতিরক্ষার অধিকারের এ নীতির আওতাধীন। তাই লেবাননিদের এ কাজও বৈধ, যৌক্তিক, বিবেক ও আইনসম্মত। কারো অধিকার নেই এ প্রশ্ন করার যে, কেন তোমরা এ প্রতিরক্ষা যুদ্ধে যোগ দিয়েছ? আর কয়েকদিন পূর্বে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী ইসরাইলের অভ্যন্তরে যে হামলা চালিয়েছে তা সম্পূর্ণ বৈধ ও আইনসম্মত একটি বিষয়। আর এ হামলাটি দখলদার যায়নবাদী ইসরাইলের অচিন্তনীয় নৃশংস অপরাধের ন্যূনতম শাস্তি বলে গণ্য। এই রক্তপিপাসু ও নেকড়ে চরিত্রের অবৈধ রাষ্ট্রটি এ অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাগলা কুকুর (যাকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে)। ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান এক্ষেত্রে যে দায়িত্ব পালন করা আবশ্যক মনে করবে কোনোরূপ দ্বিধা ছাড়া তার সম্পূর্ণ শক্তি দিয়ে দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতা সহকারে তা করবে। আমরা এক্ষেত্রে কোনো ইতস্ততা করব না, তাড়াহুড়াও করব না, শিথিলতা দেখাব না আবার ব্যতিব্যস্তও হব না। আমাদের রাজনৈতিক ও সামরিক কর্তৃপক্ষ যা করা যৌক্তিক ও যা করা সঠিক, উপযুক্ত সময়ে তা করবেন। যেমনটি পূর্বে করা হয়েছে, যদি প্রয়োজন হয় ভবিষ্যতেও তা করা হবে।

**ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান এক্ষেত্রে যে দায়িত্ব পালন করা আবশ্যক মনে করবে কোনোরূপ দ্বিধা ছাড়া তার সম্পূর্ণ শক্তি দিয়ে দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতা সহকারে তা করবে। আমরা এক্ষেত্রে কোনো ইতস্ততা করব না, তাড়াহুড়াও করব না, শিথিলতা দেখাব না আবার ব্যতিব্যস্তও হব না। আমাদের রাজনৈতিক ও সামরিক কর্তৃপক্ষ যা করা যৌক্তিক ও যা করা সঠিক, উপযুক্ত সময়ে তা করবেন।**

### দ্বিতীয় খুতবা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহর প্রশংসা করছি। তাঁর কাছেই সাহায্য চাইছি, ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁরই উপর নির্ভর করছি। আর তাঁর প্রিয় মহান রাসূল মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ও আলিহির প্রতি দরুদ ও সালাম প্রেরণ করছি। সেইসাথে তাঁর বংশের পবিত্র ইমামদের উপর আল্লাহর রহমত কামনা করছি।

### হাসান নাসরুল্লাহর শাহাদাত থেকে শিক্ষা

আমি আমার প্রিয় ভাই, আমার গর্ব, মুসলিম বিশ্বের প্রিয় মুখ, পশ্চিম এশিয়ার জাতিগুলোর মুখপাত্র এবং লেবাননের মূল্যবান রত্ন সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহর (রিজওয়ানুল্লাহ আলাইহ) প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাকে নিজের জন্য দায়িত্ব মনে করে এ জুমআয় উপস্থিত হয়েছি। সেইসাথে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই।

আমার এ খুতবাটি মূলত মুসলিম বিশ্বের সকলের উদ্দেশ্যে হলেও বিশেষভাবে ফিলিস্তিন ও লেবাননের সম্মানিত জনগণের উদ্দেশ্যে তা নিবেদিত। আমরা সবাই আমাদের প্রিয় ব্যক্তিত্ব সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহর শাহাদাতে খুবই মর্মাহত ও শোকাচ্ছন্ন। এই মহাশূন্যতা সত্যিই আমাদের হৃদয়কে মুহ্যমান করেছে। তবে আমরা শোকাহত হয়েছি এর অর্থ এটা নয় যে, আমরা বিষণ্ন, পেরেশান ও হতাশ হয়ে গিয়েছি। কারণ, এ শোকটি শহিদদের মহান নেতা ইমাম হুসাইন (আ.)-এর শাহাদাতের শোকের অনুরূপ যা উজ্জীবিতকারী, শিক্ষণীয়, আশা উদ্দীপক ও জাগরণমূলক।

সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহ আমাদের মধ্য থেকে চলে গিয়েছেন কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর আত্মা, তাঁর পথ, তাঁর হৃদয়গ্রাহী কণ্ঠ ও স্পষ্ট বাণী এখনও আমাদের মাঝে রয়েছে এবং বিদ্যমান থাকবে। তিনি অত্যাচারী শয়তানি অপশক্তি ও লুটেরা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সুউচ্চ পতাকাস্বরূপ ছিলেন। তিনি নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের পক্ষে সাহসী, স্পষ্টভাষী একজন প্রতিবাদী ও উচ্চকিত কণ্ঠ ছিলেন। তিনি সত্যাকাঙ্ক্ষী ও সংগ্রামীদের অনুপ্রেরণাদাতা বিপ্লবী নেতা ছিলেন। তাঁর জনপ্রিয়তা ও উদ্দীপনাময় প্রভাব ইরান, লেবানন ও আরব দেশগুলোর সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। এখন তাঁর শাহাদাতের মাধ্যমে এ প্রভাব আরো বৃদ্ধি পাবে।

লেবাননের প্রতিশ্রুতিবান ও নিবেদিত জনগণের জন্য তাঁর পার্থিব জীবনের কথা ও কর্মের মধ্যে যে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে তা হলো লেবাননের মহান বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব, যেমন: ইমাম মূসা সাদর, সাইয়্যেদ আব্বাস মুসাভী ও অন্যদের হারানোর বেদনা যেন আপনাদের হতাশ ও হতবিহ্বল না করে এবং সংগ্রামের পথের প্রতি আপনাদের সন্দিহান না করে। আপনারা আপনাদের প্রচেষ্টাকে জোরালোভাবে অব্যাহত রাখুন। আপনাদের পারস্পরিক ঐক্যকে আরো সুসংবদ্ধ করুন। আপনারা আগ্রাসী ও সীমা লঙ্ঘনকারী শত্রুর বিরুদ্ধে আপনাদের মনোবলকে শক্তিশালী করুন এবং তাদের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিন।

আমার প্রিয় প্রতিশ্রুতিবান লেবাননবাসী! হিযবুল্লাহ ও শিয়া আমল আন্দোলনের বিপ্লবী ও উদ্যমী আমার সন্তানতুল্য যুবকরা! সমগ্র মুসলিম উম্মাহ, লেবানন জাতি ও প্রতিরোধ আন্দোলনের কাছে আমাদের এই মহান শহিদের কামনা এটাই।

যেহেতু ভীরু, কাপুরুষ, অপবিত্র ও মানবতার শত্রু ইসরাইল আল্লাহর পথে জিহাদরত হিযবুল্লাহ, হামাস, ইসলামি জিহাদ সহ অন্যান্য শক্তিশালী ও সুসংগঠিত দলগুলোর বিরুদ্ধে পেরে উঠছে না এবং তাদের দুর্বল করতে পারছে না সেহেতু নির্বিচার বোমাবর্ষণের মাধ্যমে নিরীহ, নিরস্ত্র বেসামরিক লোকদের উপর গণহত্যা চালাচ্ছে ও নির্ভীক সাহসী সংগ্রামী নেতাদের সন্ত্রাসী হামলার মাধ্যমে কাপুরুষোচিতভাবে হত্যা করছে। আর এটাকেই নিজেদের বিজয় বলে গণ্য করছে। কিন্তু এর পরিণতি কী? এসব অপকর্মের ফল হলো তাদের বিরুদ্ধে স্তরীভূত উপচে পড়া জনরোষ, সংগ্রামী চেতনার উজ্জীবন এবং আরো বেশি আত্মোৎসর্গী নেতা ও যোদ্ধার আবির্ভাব। ফলে এই রক্তপিপাসু নেকড়ের বিচরণের গণ্ডি আরো

সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে এবং অধিক শত্রুবেষ্টিত হয়ে পড়ছে। ইনশাআল্লাহ পরিশেষে এই নিকৃষ্ট পশুর নিধনের মাধ্যমে মুক্তি অর্জিত হবে।

হে আমার প্রিয়জনেরা! শোকাহত অন্তরগুলো আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনার মাধ্যমে প্রশান্তি লাভ করে। এ ধ্বংসযজ্ঞের ক্ষতি একদিন পূরণ হবে, সেদিন আপনাদের এ ধৈর্য, ত্যাগ ও প্রতিরোধের কথা মর্যাদা ও সম্মানের সাথে স্মরণ করা হবে।

এই প্রিয় শহিদ, আওলাদে রাসূল প্রতিরোধ আন্দোলনের কঠিন পথের নেতৃত্বে ছিলেন। তিনি হিযবুল্লাহকে ধাপে ধাপে সামনে এগিয়ে নিয়ে উচ্চ এক পর্যায়ে পৌঁছিয়েছেন। তাঁর উপমা হলো পবিত্র কুরআনের এ আয়াত 'যেমন কোনো শস্যক্ষেত্র যা হতে প্রথমে কিশলয় নির্গত হয়, পরে একে মজবুত করে, অতঃপর তা পুষ্ট হয়। এরপর নিজ কাণ্ডের উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়ায় যা কৃষককে পরিতুষ্ট করতে থাকে। যেন এরূপে তিনি (আল্লাহ) তাদের (বিশ্বাসীদের সমৃদ্ধি) দ্বারা অবিশ্বাসীদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করেছে ও সৎকর্ম করেছে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও মহাপ্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দান করেছেন।' (সূরা ফাত্হ : ২৯)

এই মহান সাইয়্যেদ ধৈর্যের সাথে এমন সুষ্ঠু ও সুপরিকল্পিতভাবে হিযবুল্লাহকে পরিচালনা করেন যে, তা স্বাভাবিক গতিতে যৌক্তিকভাবে ধাপে ধাপে বিকশিত হতে থাকে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে তার শক্তিশালী উপস্থিতি যায়নবাদী শত্রুকে পিছপা হতে বাধ্য করে এবং শত্রুর সামনে নিজের শক্তিমত্তার প্রকাশ ঘটায়। এটাই পবিত্র কুরআনের ভাষায় এভাবে বর্ণিত হয়েছে : 'আল্লাহ কীভাবে পবিত্র বাণীর উপমা পবিত্র বৃক্ষের দ্বারা বিবৃত করেছেন... তা (এ বৃক্ষ) নিজ প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে সকল সময়ে ফলদান করে।' (সূরা ইবরাহিম : ২৪) প্রকৃতই হিযবুল্লাহ একটি পবিত্র বৃক্ষ। হিযবুল্লাহ এবং এর মহাবীর শহিদ নেতা লেবাননের ঐতিহ্যের পরিচয় দানকারী এবং এর ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সব গুণের নির্যাস বলে গণ্য।

আমরা ইরানিরা অনেক পূর্ব থেকেই লেবানন ও এর বিশেষ মর্যাদাগত অবস্থানের বিষয়ে অবহিত। শহিদ মুহাম্মাদ বিন মাক্কি আমেলি, আলি ইবনে আবদুল আল, শহিদ যাইনুদ্দিন আমেলি, হুসাইন আবদুস সামাদ আমেলি এবং তাঁর সন্তান মুহাম্মাদ বাহাউদ্দীন (শেখ বাহায়ী নামে প্রসিদ্ধ) প্রমুখ মহান মনীষী ও আলেমরা এ ভূমিরই সন্তান। এসব মনীষী অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ হিজরি শতকে তাঁদের বরকতময় জ্ঞান দ্বারা ইরানের ভূমিকে সিক্ত করেছেন। বর্তমানে ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত লেবাননের ঋণ শোধ করা আমাদের ইরানিদের সহ সকল মুসলমানের দায়িত্ব।

**পাশ্চাত্যের ষড়যন্ত্র ও প্রতিরোধ আন্দোলনের আবশ্যকতা**

শহিদ সাইয়্যেদ নাসরুল্লাহর নেতৃত্বে হিযবুল্লাহ গাজার প্রতিরক্ষা, মসজিদুল আকসাকে মুক্ত করার লক্ষ্যে জালেম ও অবৈধ দখলদার ইসরাইলের বিরুদ্ধে জীবন বাজি রেখে জিহাদ করেছে। তারা মুসলিম বিশ্বের প্রাণের ভূখণ্ড ফিলিস্তিন পুনরুদ্ধারে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। আমেরিকা ও তার দোসররা অবৈধ দখলদার ইসরাইলের নিরাপত্তা বিধানের রাজনৈতিক স্লোগানের অন্তরালে তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ হাসিলের-মধ্যপ্রাচ্যের সকল সম্পদ হস্তগত করা-চেষ্টা করছে এবং এজন্য এ ধ্বংসাত্মক অপশক্তিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। এভাবে তারা বিশ্বব্যাপী সংঘর্ষ সৃষ্টির ক্ষেত্র তৈরি করছে। তাদের উদ্দেশ্য হলো ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডকে

পশ্চিম এশিয়ার তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ পাশ্চাত্য ও ইউরোপে রপ্তানির চ্যানেল ও করিডোর হিসেবে ব্যবহার করা এবং এ পথে পাশ্চাত্য থেকে টেকনোলজি ও পণ্য সামগ্রী এ অঞ্চলে আমদানি করা। এভাবে তারা চাইছে দখলদার ইসরাইলের অস্তিত্বকে স্থায়িত্ব দান করে পুরো পশ্চিম এশিয়াকে ইসরাইলের উপর নির্ভরশীল করতে। বর্তমানে ফিলিস্তিনি ও লেবাননের সংগ্রামী মানুষের প্রতি রক্তপিপাসু ইসরাইল কর্তৃক পরিচালিত নৃশংস আচরণ ঐ কলুষিত উদ্দেশ্যে পৌছার জন্যই। এ বাস্তবতা আমাদের সামনে এ সত্যকে স্পষ্ট করে যে, দখলদার শক্তির উপর যে কোনো আঘাত–তা যে কোনো দল ও গোষ্ঠীর পক্ষ থেকেই হোক–পশ্চিম এশিয়ার প্রতিই শুধু নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির প্রতিই খেদমত।

নিঃসন্দেহে যায়নবাদী ইসরাইল ও আমেরিকার এ স্বপ্ন কখনই বাস্তব রূপ লাভ করবে না। কারণ, ঐ বাতিল রেজিম ঐশী বর্ণনায় আসা অপবিত্র সেই বৃক্ষ যার শেকড় অগভীর হওয়ায় কোনো স্থায়িত্ব নেই। শেকড়হীন, কৃত্রিম, অস্থায়ী, অপবিত্র ও অবৈধ এ রাষ্ট্রটি নিছক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় কোনো রকমে নিজেকে টিকিয়ে রেখেছে। আল্লাহর ইচ্ছায় এটি আর বেশিদিন টিকবে না।

আমাদের এ দাবির সপক্ষে স্পষ্ট দলিল হলো এক বছর হয়ে গেল, এই শত্রু অনেক বিলিয়ন ডলার খরচ করে এবং আমেরিকা ও পাশ্চাত্যের কয়েকটি রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা ও পরিপূর্ণ সহায়তা নিয়ে গাজা ও লেবাননের অবরুদ্ধ কয়েক হাজার আল্লাহর পথের মুজাহিদের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছে, কিন্তু কোনো বিজয়ই অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। তাদের সঙ্গে পেরে না উঠে নিরীহ ও নিরস্ত্র মানুষের গৃহসমূহ, হাসপাতাল, মাদ্রাসা, মসজিদ, আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ ও ফল ফসলাদির জমির উপর বোমাবর্ষণ করে চলেছে এবং এতেই নিজেদের কৃতিত্ব ও বীরত্ব প্রকাশ করছে! বর্তমানে এ অপরাধী গোষ্ঠীর একাংশ এ কথা স্বীকার করছে এবং এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, কখনই হামাস ও হিযবুল্লাহর উপর জয়ী হওয়া সম্ভব নয়।

**প্রতিরোধ আন্দোলন বিজয়ী হবেই**

হে ফিলিস্তিন ও লেবাননের প্রতিরোধী জনগণ! হে সাহসী যোদ্ধারা! হে ধৈর্যশীল ও সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল লোকসকল! এসব মহান ব্যক্তির শাহাদাতের ফলে যে রক্ত মাটিতে ঝরেছে তা আপনাদের আন্দোলনকে কখনই দুর্বল করবে না; বরং একে সুদৃঢ় করবে। ইরানের ইসলামি বিপ্লবের বিজয়ের তিন বছর পর এক গ্রীষ্মে ইরানের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের একটি বড় অংশ যাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রধান বিচারপতি আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ বেহেশতি, রাষ্ট্রপতি রাজায়ি, প্রধানমন্ত্রী বহোনারসহ বাহাত্তর জন এবং প্রথম সারির আলেমদের মধ্যে আয়াতুল্লাহ মাদানি, আয়াতুল্লাহ কুদ্দুসি, হাশেমীনেজাদ প্রমুখ শহিদ হন। এঁরা সকলেই জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিপ্লবের ভিত্তি বলে গণ্য হতেন। তাঁদেরকে হারানো বিপ্লবের জন্য সহজ কোনো বিষয় ছিল না। কিন্তু তাঁদের শাহাদাতে এ বিপ্লব স্থবির ও স্তব্ধ হয়ে যায়নি। পিছিয়েও পড়েনি; বরং বিপ্লব আরো গতিশীল হয়েছে। দ্রুত সামনে অগ্রসর হয়েছে। এই মহান ব্যক্তিদের শাহাদাতেও প্রতিরোধ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়বে না; এ প্রতিরোধ আন্দোলন অবশ্যই বিজয়ী হবে।

গাজার প্রতিরোধ আন্দোলন সারা বিশ্বকে স্তম্ভিত করেছে; ইসলামকে বিশ্ববাসীর কাছে সম্মানিত করেছে। গাজায় ইসলাম সকল অন্যায় অপশক্তি, মন্দ ও অশুভ এবং নির্মমতা ও নির্দয়তার বিরুদ্ধে ঢাল হয়েছে। কোনো বিবেকবান ও স্বাধীন মানুষ নেই, যে ফিলিস্তিনিদের অদম্য মানসিকতা, সাহসিকতা, ঈমানি শক্তি ও প্রতিরোধের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবে না এবং এর বিপরীতে রক্তপিপাসু, অসুর ও পিশাচ ইসরাইলের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করবে না।

গত এক বছরে 'আল আকসার ঝড়' নামক প্রতিরোধ আন্দোলনটি দখলদার ইসরাইলকে এমন এক স্থানে নিয়ে গেছে যে, তার অস্তিত্বই হুমকির মুখে পড়েছে। এই রেজিম তার অশুভ জন্মলগ্নে (উৎপত্তির প্রথম বছরগুলোতে) যে বিষয়টি নিয়ে সবচেয়ে বেশি চিন্তিত ছিল তা এখন আবার প্রকট আকার ধারণ করেছে। সুতরাং এটা লেবানন ও ফিলিস্তিনের সংগ্রামী জনতা ও প্রতিরোধ আন্দোলনের বড় সাফল্য যে, যায়নবাদীদেরকে সত্তর বছর পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে।

পশ্চিম এশিয়া বিশেষত ফিলিস্তিন ও লেবাননের পশ্চাদপদতা, নিরাপত্তাহীনতা ও যুদ্ধের অবস্থায় থাকার সবচেয়ে বড় কারণ হলো অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের অস্তিত্ব এবং এ অঞ্চলে এমন কিছু শাসক ও ক্ষমতাধর গোষ্ঠীর উপস্থিতি যারা মুখে দাবি করে যে, তারা শান্তিপূর্ণ ও স্থিতিশীল পশ্চিম এশিয়া চায় (কিন্তু বাস্তবে তাদের কোনো পদক্ষেপ নেই)। এ অঞ্চলের মূল সমস্যা হলো বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপ। এ অঞ্চলের সরকারগুলোর এতদঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা দানের পূর্ণ সক্ষমতা রয়েছে। মুক্তির দিশারী এ মহান লক্ষ্যে পৌছার জন্য মুসলিম বিশ্বের জাতিসমূহ ও সরকারগুলোর সমবেত প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের প্রয়োজন রয়েছে। এ পথে যারা প্রচেষ্টা চালাবে আল্লাহ তাদের সঙ্গে রয়েছেন। অবশ্যই আল্লাহ তাদেরকে বিজয়দানে পূর্ণ সক্ষম।

আল্লাহর শান্তি শহিদ নেতা হাসান নাসরুল্লাহ, বীর মুজাহিদ শহিদ ইসমাইল হানিয়াহ এবং আমাদের গর্বের সেনানায়ক জেনারেল কাসেম সোলায়মানীর উপর বর্ষিত হোক।

অনুবাদ : ড. এ কে এম আনোয়ারুল কবীর

# মহানবী (সা.) : বিশ্ব মুসলিমের ঐক্যের অক্ষ

মীর আশরাফ-উল-আলম

## ভূমিকা

সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ নিখুঁত শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতির ভিত্তিতে এ বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন। তাই এই পৃথিবীতে মানুষের উচিত অন্যান্য প্রাণীর সাথে সম্প্রীতি ও ঐক্য বজায় রাখার মাধ্যমে উপকৃত হওয়া এবং এর উপর ভিত্তি করে স্বীয় জীবনকে পরিচালনা করা যাতে পার্থিব জীবনে ও পরকালে সুখ ও সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে।

পবিত্র কুরআন ঐক্য ও সংহতিকে প্রতিটি জাতির মর্যাদা ও শক্তির কারণ বলে মনে করে। তবে এই ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করতে হলে অবশ্যই এমন একজন নেতার প্রয়োজন যিনি এটাকে বলবৎ করতে পারেন। আর এই মর্মে সূরা আনফালে বলা হচ্ছে :

وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

'আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করো না, তাহলে তোমরা সাহসহারা হয়ে যাবে, তোমাদের শক্তি-ক্ষমতা বিলুপ্ত হবে। আর তোমরা ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।' ১

পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিতে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি অর্জনের শর্ত হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য ও ধৈর্য। কেননা, তিনি ঐক্যের নবী ও রহমতের দূত এবং আল্লাহর রহমতের ঝরনাধারা। আর তা পবিত্র কুরআনে সূরা আলে ইমরানে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنتَ لَهُمْ

'অতএব আল্লাহর অনুগ্রহ এই যে, তুমি তাদের প্রতি কোমলচিত্ত...' ২

ঐক্য, সংহতি বা একত্বের জন্য মহানবী (সা.)-এর আহ্বান কেবল কয়েকজনের নয়, বরং আল্লাহর সকল নবীরই আহ্বান। তাঁর জীবনাদর্শই মুসলিম বিশ্বের বর্তমান অবস্থার নীতি ও মানদণ্ড এবং ব্যাখ্যাকারী। এ মর্মে ইসলামি ঐক্যের বিষয়টি শুধু তাঁর জীবদ্দশার আলোচনায় বিবেচিত নয়, বরং এটি এমন একটি বিষয় যা বর্তমানে ইসলামি সমাজকে প্রভাবিত করে।

## ইসলামি ঐক্য বা সংহতির ধারণা

যদি আমরা ইসলামি ঐক্য বা সংহতির কথা বলি, তাহলে এর অর্থ হলো: ইসলামি ভূখণ্ডের জাতিগুলোকে তাদের বন্ধন দৃঢ় করতে হবে, যাতে শত্রুর অনুপ্রবেশের পথ বন্ধ হয়ে যায়। আরবি সাহিত্যের দৃষ্টিতে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয় সেখানে, যখন আপনি এক গ্লাস পানিতে কালি মিশিয়ে দেবেন এমনভাবে, যার মধ্যে এক ধরনের সামঞ্জস্যতা দেখা যায়। যদি এক ব্যক্তির সাথে অন্য ব্যক্তির চিন্তাভাবনার সাদৃশ্য থাকে, সেক্ষেত্রে বলা হয় যে, তাদের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি একে অপরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; যদিওবা সেখানে অদৃশ্য কোনো পার্থক্যও থেকে থাকে। তবে ঐ পার্থক্যগুলো এতটা গভীর নয় যে, তা তাদের মধ্যে দ্বৈততা সৃষ্টি করতে পারে। দুটি সুসংগত জিনিসের মধ্যে এক ধরনের ঐক্য পাওয়া যায়, যার কারণে ঐ দুটিকে একে অপর থেকে আলাদা করা কঠিন এবং কখনও কখনও অসম্ভব। ইসলামি দেশগুলোকে অবশ্যই ঐক্যের জন্য সচেষ্ট হতে হবে। ইসলাম ধর্ম ও পবিত্র কুরআন তাদের উপর এই দায়িত্ব অর্পণ করেছে। যদিও একটি জাতির রীতিনীতি বা প্রথা ও সংস্কৃতি অন্য জাতির থেকে আলাদা, কিন্তু ব্যাপক সাংস্কৃতিক ও উদ্দেশ্যের অভিন্নতার কারণে এসব জাতি ঐক্য ও সংহতি অর্জন করতে পারে। মুসলিম উম্মাহ, যদিও বহু এবং বৈচিত্র্যময় জাতি ও বর্ণের সমন্বয়, তবুও তাদের মধ্যে একটি অভিন্নতা রয়েছে যা এই উপসংস্কৃতিগুলোকে একে অপরের সাথে ঐক্যবদ্ধ করে থাকে। আর এটাকেই পবিত্র কুরআনে আল্লাহর রঙ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

রাসূল (সা.)-এর জীবদ্দশায় ইসলামি ঐক্য বা সংহতি এবং এর সুসংহতকরণ

মহানবী (সা.)-এর রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে ঐক্য বা সংহতিই ছিল অন্যতম উদ্যোগ। কারণ একটি শক্তিশালী ও দৃঢ় সমাজব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন ঐক্য ও সহানুভূতি। সকল ক্ষেত্রে জাতির মর্যাদা ও কর্তৃত্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো ঐক্য বা সংহতি। আর এটি তৈরি করার জন্য ঐশী নবিগণ, বিশেষ করে

মহানবী (সা.) ছিলেন প্রথম সারির একজন, যিনি মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির প্রতি মনোনিবেশ করেছিলেন। এমনভাবে যে, তিনি তাঁর জীবদ্দশায় প্রায়শই উপদেশমূলক খুতবাগুলোর মধ্যে মুসলিম উম্মাহকে উদ্দেশ্য করে বলতেন :

اَيهَا النّاس، اِنّ دِمَاءَكُم وَ اَموَالَكُم عَلَيكم حَرَامٌ اِلى اَن تَلقَوا رَبّكُم، اَيهَا النّاس اِسمَعُوا قَولِى وَ اِعقَلُوا، اِعلَمُوا اِنّ كُلّ مُسلِم اَخٌ لِلمُسلِم وَ اِن المُسلِمِين اِخوَة

‘হে লোকসকল! তোমাদের একের রক্ত ও ধন-সম্পদ তোমাদের অপরের জন্য হারাম, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের পালনকর্তার সাথে মিলিত হচ্ছ। হে মানুষ! আমার কথা শোন এবং চিন্তা করো, আর জেনে রেখো, নিশ্চয়ই প্রত্যেক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই, নিশ্চয়ই মুসলমানরা একে অপরের ভাই ভাই।’

স্বল্প সময়ের মধ্যেই তিনি শত বছরেরও বেশি সময় ধরে যুদ্ধ ও রক্তপাত করে আসা গোত্রগুলোর মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন এবং তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে মদিনায় একটি শক্তিশালী ফ্রন্ট

তৈরি করেন। ৩

মুসলিম উম্মাহকে এগিয়ে নিতে ইসলামের প্রিয় নবী (সা.) সর্বপ্রথম যে আহ্বানটি জানিয়েছিলেন তা ছিল ঐক্য বা সংহতির। আল্লাহর একত্ববাদের উপর ভিত্তি করে একতা ও ঐক্য:

قُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا الله، تُفْلِحُوا

(হে লোকসকল!) বল : ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’, (আর) তোমরা সফল হয়ে যাও। ৪

যখন এটা স্পষ্ট হলো যে, আল্লাহ এক এবং সকল সৃষ্টি তাঁর কাছে অভিন্ন, আর সকলেই তাঁর দাস এবং তিনি ছাড়া অন্য কারো হাতে তাদের কর্তৃত্ব নেই এবং কোনো মানুষই অন্য মানুষের দাস বা উপাস্য নয়, তখন এটা প্রমাণিত যে, কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করতে পারে না এবং তাকে তার ইচ্ছা অনুযায়ী শর্ত ও বিধিনিষেধের অধীন করতে পারে না। ৫ সুতরাং একত্ববাদের আহ্বান প্রথমত, প্রতিটি জাতি নিজের জন্য যে দেবতাদের উপাসনা করছিল তা প্রত্যাখ্যানের এবং আকিদাগতভাবে ঐক্যের কারণ হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, আকিদাগত এই ঐক্য কর্মের ঐক্যের দিকে পরিচালিত করেছিল।

মহানবী (সা.) মানুষকে আল্লাহ ও একত্ববাদের দিকে আহ্বান করে মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি মানুষকে এটা বোঝানোর পাশাপাশি যে, মানুষ এবং পৃথিবীর স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ, এ বিষয়টিও স্পষ্ট করেছেন যে, সমস্ত মানুষ সমান এবং একই উৎস থেকে সৃষ্ট। আর তাদের সকলের পিতা-মাতাও একই এবং তিনি আল্লাহর বাণী থেকে বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً...

‘হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক নফস থেকে। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী।...’ ৬

এটা নিশ্চিত যে, যখন সবাই জানবে যে, তাদের স্রষ্টা একই এবং প্রত্যেকেই একই উৎস ও একই পিতা-মাতা থেকে এসেছে, তখন তারা একে অপরের প্রতি সদয় হবে এবং তাদের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

মহানবী (সা.) জানতেন যে, মানুষের মধ্যে ইসলামি ঐক্যকে বাধাগ্রস্ত করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো বর্ণ ও জাতিগত বন্ধন এবং গোত্রীয় কুসংস্কার। তিনি তাঁর আচার-আচরণ ও বাচনভঙ্গিতে সকল মানুষকে সমান মনে করতেন এবং তাদের মধ্যে তাকওয়াকে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হিসেবে তুলে ধরতেন।

أَيُّهَا النّاسُ! اِنّ رَبّكُمْ واحِدٌ و اِنّ اَباكُمْ واحِدٌ كُلّكُمْ لآدَمَ وَ آدَمُ مِنْ تُراب«اِنّ اَكرَمَكُمْ عِنْدَ الله اَتْقيكُمْ »وَ لَيْسَ لِعَرَبِيّ عَلى عَجَمِيّ فَضْلٌ اِلاّ بِالتّقْوى.

হে লোকসকল! নিশ্চয়ই তোমাদের রব এক, তোমাদের পিতাও এক, তোমরা সবাই আদম থেকে এবং আদম মাটি থেকে, নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়াপরায়ণ– তাকওয়া ব্যতীত অনারবের উপর আরবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। ৭

তিনি জাতিগত ও গোত্রীয় শ্রেষ্ঠত্ব ধ্বংস করার নিমিত্তে সাহাবিদেরকে বলেছিলেন :

لَيَدَعَنّ رِجالٌ فَخرَهُمْ بِأقْوام، إنّما هُمْ فَحمٌ مِنْ فحْم جَهَنّمَ، أوْ لَيَكونُنّ أهْونَ عَلى الله مِنَ الْجِعْلَانِ الّتى تَدْفَعُ بِأنفُها النّتِنَ

‘যারা তাদের জাতিসত্তা নিয়ে গর্বিত তাদের উচিত এটি ছেড়ে দেওয়া। নিশ্চয়ই তা জাহান্নামের (জ্বালানি) কয়লার মধ্যে একটি

কয়লা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং তারা যদি এটি করা বন্ধ না করে তবে আল্লাহর নিকট তারা নাক দিয়ে ময়লা বহনকারী তেলাপোকার চেয়েও নিচু স্তরের।' [৮]

তিনি সকল গোত্রকে একত্রিত ও প্রতিটি গোত্রের অহংকারের কারণগুলোকে দূর করার জন্য–যা ছিল তাদের মধ্যে মতভেদ ও বিচ্ছিন্নতার কারণ–জনগণের কাছে গোত্রের অস্তিত্বের দর্শন ব্যাখ্যা করেছিলেন। আর এ মর্মে ওহির আদলে বলেছিলেন: গোত্র এবং উপজাতীয় শাখাসমূহ শুধু ব্যক্তির সনাক্তকরণ এবং পরিচিতির জন্য এবং তা কখনই বিশেষাধিকার ও শ্রেষ্ঠত্বের দিকে নিয়ে যায় না:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا...

হে লোকসকল! আমি তোমাদেরকে এক নারী ও এক পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার...। [৯]

স্পষ্টতই, এমন একটি ধর্ম যা বিশ্বকে শান্তি, সফলতা ও সৌভাগ্য, জ্ঞানের আলোকে সহাবস্থান ও সংহতি এবং তাকওয়ার দাওয়াত দেয়, একে ইসলামের মতো যোগ্য ও সঠিক নামে ডাকা উচিত। যাতে এটি থেকে একই অর্থ এবং মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ গন্তব্য বোঝা যায়। আর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে এই ধর্মে হস্তক্ষেপ না করে সেজন্য নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

'...আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে...।' [১০]

তিনি পূর্ণাঙ্গ ধর্ম ইসলামকে তাদের বলে এবং এই সম্পূর্ণতাকে তাদের উপর আল্লাহর আশীর্বাদের পরিপূর্ণতা বলে অভিহিত করেন এবং তা থেকে সকল প্রকার সন্দেহ ও ত্রুটির সম্ভাবনা দূর করে দেন। আর নিয়ামতের পূর্ণতার সুসংবাদ প্রদানের মাধ্যমে নতুন কোনো নিয়ামত অবতরণের অপেক্ষায় না থাকার জন্য বলেন। এর ফলে মুসলমানরা ইসলামের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ নিয়ে যেকোনো ধরনের উদ্বেগ থেকে মুক্তি পায়।

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন, ধর্ম বা দ্বীন (ইসলাম), রাসূল (সা.) এবং গ্রন্থের (পবিত্র কুরআন) মধ্যে এই একতা ছিল ইসলামের ভিত্তি। যা প্রায় ১৫০০ বছর ধরে ধর্মকে ধ্বংসাত্মক উপাদানের প্রভাব থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে এবং ধর্মের স্তম্ভগুলোতেও কোনো মৌলিক পার্থক্য সৃষ্টি করেনি। পৃথিবীর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে স্বল্প সময়ের মধ্যে ইসলামের প্রসার হচ্ছে এক অনন্য ঐতিহাসিক ঘটনা।

প্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন গোত্র, গোষ্ঠী ও বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের প্রবণতা, যার প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা এবং সুনির্দিষ্ট বুদ্ধিবৃত্তিক ও আদর্শগত ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তা সত্ত্বেও ইসলাম ধর্মে কোনো প্রকার বিভেদ সৃষ্টি হওয়া ব্যতিরেকেই তিনি সবকিছুকে নতুন আঙ্গিকে সাজান এবং তাদের মধ্যে একটি অভূতপূর্ব বোঝাপড়া তৈরি করেন।

এই পরিপূর্ণ ধর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক ও সামাজিক আদেশগুলোর মধ্যে একটি হলো যুদ্ধ, বিবাদ এবং লড়াইয়ের অনুপস্থিতি। ইসলাম মুসলমানদের এমন কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকাকে পছন্দ করে না যা বলা অপ্রয়োজনীয় এবং অন্য কথায়, অন্যদের উপর তা কোনো প্রভাব ফেলে না বা বিভক্তি ও বিচ্যুতির কারণ হয়ে থাকে। এ মর্মে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ...

'আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা বিভক্ত হয়েছে এবং মতবিরোধ করেছে তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আসার পরও। আর তাদের জন্যেই রয়েছে মহাশাস্তি।' [১১]

**সর্বোপরি আমরা দেখতে পাই যে, ঐক্য বা সংহতি নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে মহানবী নিজ শাসনামলের শুরুতেই মদিনায় তিনটি চুক্তি সম্পাদন করেন। যা তাঁর সরকারের ভিত্তিকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে দুর্দান্ত প্রভাব ফেলে। মদিনার জনগণ অর্থাৎ মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ের মধ্যে প্রথম চুক্তি, যাতে শহরের মধ্যে অবস্থানকারী অন্য ধর্মাবলম্বীরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং দ্বিতীয় চুক্তিটি ছিল মুহাজির ও আনসারসহ মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের চুক্তি।**

সর্বোপরি আমরা দেখতে পাই যে, ঐক্য বা সংহতি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মহানবী নিজ শাসনামলের শুরুতেই মদিনায় তিনটি চুক্তি সম্পাদন করেন। যা তাঁর সরকারের ভিত্তিকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে দুর্দান্ত প্রভাব ফেলে। মদিনার জনগণ অর্থাৎ মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ের মধ্যে প্রথম চুক্তি, যাতে শহরের মধ্যে অবস্থানকারী অন্য ধর্মাবলম্বীরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং দ্বিতীয় চুক্তিটি ছিল মুহাজির ও আনসারসহ মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের চুক্তি। [১২]

তিনি মুসলিমদের মধ্যে ভালোবাসা ও ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি এবং ইসলামি সমাজের বিভিন্ন স্তরের গভীরে ঐক্যের মূল স্থাপন করার জন্য তাদের মধ্যে 'ভ্রাতৃত্বের বন্ধন' কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেন। এ লক্ষ্যে, তিনি তাঁর রেসালতি দায়িত্ব পালনকালে দুবার ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন কল্পে আদেশ করেছিলেন: প্রথমবার হিজরতের আগে মক্কায় এবং দ্বিতীয়বার হিজরির প্রথম বছরে মদিনায়। মহানবী (সা.) আল্লাহর পক্ষ থেকে মুহাজির ও আনসারদের একে অপরের সাথে ভাই বানানোর দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাই তিনি একটি জনসমাবেশে সমস্ত মুসলমানকে সম্বোধন করে বলেছিলেন: تَآخَوْا فِي اللهِ أَخَوَيْنِ أَخَوَيْنِ আল্লাহর খাতিরে দুজন দুজন করে একে অপরের ভাই হয়ে যাও। [১৩] আর ইবনে হিশামের 'ইতিহাস' সহ মুসলিমদের ইতিহাসে, যাঁরা সেদিন একে অপরের ভাই হয়েছিলেন

তাঁদের বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে।

এই পরিকল্পনার মাধ্যমে তিনি রাজনৈতিক ঐক্যকে মুসলমানদের আধ্যাত্মিক ঐক্যের সাথে বেঁধে দেন, যাতে মুসলিম ঐক্যের ভিত্তি মজবুত থাকে। [১৪] ইসলামের শুরুতে এবং মহানবী (সা.)-এর যুগে মুসলমানদের বিজয় ও গর্বের রহস্য ছিল সহানুভূতি ও আনুগত্য। যা ছিল আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং নবী (সা.)-এর স্বর্গীয় বাণী ও বিজ্ঞ উপদেশের প্রতি আস্থার উপর ভিত্তিশীল এবং জাতি, উপজাতি, গোত্র বা সাম্প্রদায়িক ও ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য হাসিল করার আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে বেরিয়ে আসা।

ভ্রাতৃত্বের ছায়াতলে যে ঐক্য গড়ে ওঠে তা কেবল সেই নীতির উপর ভিত্তি করে যা সকল মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত। মহানবী শুধু মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যের ডাক দেননি, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে শান্তির কথাও ভেবেছেন; তাই তিনি মদিনার আশেপাশের অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথেও শান্তি চুক্তি করেন।

এটা নিশ্চিত, ভ্রাতৃত্বের ছায়াতলে যে ঐক্যের উদ্ভব হয় তা কেবল সকল ইসলামি সম্প্রদায়ের মধ্যে অভিন্ন নীতির উপর ভিত্তি করে। মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি মহানবী (সা.) অন্যান্য দ্বীন ধর্মের মধ্যেও শান্তি ও সম্প্রীতি চেয়েছিলেন। [১৫]

এ মর্মে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُم وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

‘নিশ্চয়ই মু'মিনরা পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।’ [১৬]

এ কাজের মাধ্যমে ঈমান ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে ইসলামি সমাজ কাঠামো সুদৃঢ় হয়েছিল। বিভাজনের ক্ষেত্র, জাতিকেন্দ্রিকতা এবং গোত্রীয় ও জাতিগত আধিপত্য এবং অন্য বিভাজনকারী কারণগুলো শেষ হয়ে গিয়েছিল। [১৭]

**মোদ্দাকথা**

ইসলামের প্রাক্কালে মুসলমানদের বিজয় ও গর্বের রহস্য ছিল ঐক্যের প্রতি মহানবী (সা.)-এর আহ্বান বা এর উর্ধ্বে সমাজে যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যার কারণে মানুষ রাজনৈতিক, সামাজিক ও চিন্তাগত বিভেদ ও উত্তেজনা এড়িয়ে চলেছে।

এগুলো হলো মহানবী (সা.)-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও কৃতিত্ব। সাধারণভাবে, মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রতিষ্ঠায় তাঁর ভূমিকা তিনটি মৌলিক অক্ষের অন্তর্ভুক্ত।

প্রথমত, তৎকালীন আরব সমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে সকল প্রচেষ্টা চালানো এবং ভিত্তি স্থাপনের জন্য ‘রাজনৈতিক’ উপায়-উপকরণের ব্যবহার। অতঃপর, ‘সাংস্কৃতিক’ পরিকল্পনা প্রণয়ন– যা মুসলমানদের সুদীর্ঘ একক জাতির দৃষ্টিভঙ্গির রূপকার এবং চিন্তা-চেতনা বিকশিত করার জন্য পরিবেশ তৈরি ও তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন করার নিমিত্তে মানুষের বিবেক-বুদ্ধির উন্নতি সাধন করে। আর পরিশেষে, মহানবী (সা.) ঐক্য অর্জনের মাধ্যম হিসেবে যে সমাধানযোগ্য পন্থাসমূহ ব্যবহার করেছেন সেগুলোকে প্রয়োগ করা।

প্রিয় নবী (সা.) বারবার ‘মুসলিমদের ধর্মীয় ঐক্য’ প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় এই বিষয়টির উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন–তাঁর বাণীর একটি অংশে–যা কারো কারো মতে মক্কা বিজয়ের পর এবং মাসজিদুল হারামে প্রদান করেছিলেন। [১৮] সেখানে বলা হয়েছে :

المُسلمُ أخُو المُسلم؛ لا يَخونُهُ، و لا يَخذُلُهُ، و لا يَعيبُهُ، و لا يَحرِمُهُ، ولا يَغتابُهُ

একজন মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাই; সে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে না, তাকে ছেড়ে যায় না, তার সমালোচনা করে না, তাকে বঞ্চিত করে না এবং তার গিবত করে না। [১৯]

আরো বলা হয়েছে :

المؤمنونَ إخْوَةٌ، تَتَكافى دِماؤهُم، وَ هُمْ يَدٌ على مَن سِواهُم، يَسْعى بِذِمَّتِهِم أدناهُم

সকল মুমিন একে অপরের ভাই এবং প্রত্যেকের রক্ত অপরের রক্তের সমান এবং বিধর্মীদের বিরুদ্ধে তারা এক ও অভিন্ন এবং তাদের মধ্যে ক্ষুদ্রতম ব্যক্তি মুসলমানদের পক্ষে অঙ্গীকার করতে পারে। [২০]

অতএব, মুমিনদের মধ্যে দ্বীন ও ঐক্যের এমন একটি সাধারণ বোধের সৃষ্টি মহানবী (সা.)-এর সুন্দর বক্তব্যে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে :

اَلْمُؤْمِنُونَ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ

মুমিনরা এক আত্মার অধিকারী। [২১]

---

০১ - সূরা আনফাল, আয়াত নং- ৪৬।
০২ - সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং-১৫৯।
০৩ - ইবনে হিশাম, আবু মুহাম্মাদ আবদুল মালিক, আস্ সিরাতুন্নাবাবিয়্যাহ, খণ্ড ৪, পৃ. ২৫১।
০৪ - মুসনাদ ইবনে হাম্বাল, খণ্ড ৫, পৃ. ৪২৩, হাদিস নং ১৬০২৩, আলমুস্তাদরাকু আ'লাস সাহিহাইন, খণ্ড ১, পৃ. ৬১, হাদিস নং ৩৯, বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড ১৮, পৃ. ২০২।
০৫ - কিতাবে ওয়াহদাত, প্রস্তুতি ও সম্পাদনা: গবেষণা ও রচনা বিভাগ, ইসলামি নির্দেশনা মন্ত্রণালয়, পৃ. ১৫৮।
০৬ - সূরা নিসা, আয়াত নং ১।
০৭ - তোহাফুল উকূল, পৃ. ৩৪; মোর্তযা মোতাহহারি, ইসলাম ও ইরানের পারস্পরিক অবদান, পৃ. ৫১; ইবনে হিশাম, খণ্ড ২, পৃ. ৪১৪।
০৮ - সুনানে আবু দাউদ, খণ্ড ২, পৃ. ৬২৪।
০৯ - সূরা হুজুরাত, আয়াত নং ১৩।
১০ - সূরা মায়েদা, আয়াত নং ৩।
১১ - সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং ১০৫।
১২ - দেখুন: ইসলামের ইতিহাস, মাহদি পিসভায়ী, হিজরি প্রকাশনী, তেহরান, ১৩৬৫, পৃ. ৪২-৫৩।
১৩ - সিরাতুন নাবাভীয়্যাহ, খণ্ড ২, পৃ. ১২৪।
১৪ - জাফর সোবহানী, ইসলামের নবীর ইতিহাস থেকে কিছু অনুচ্ছেদ, মাশার প্রকাশনী, পৃষ্ঠা ২১৪; এবং ইবনে হিশামের জীবনী, খণ্ড ২, পৃ. ১২৩; এবং মাসিব আকবারী, "ইসলামের দুটি নীতি হিসাবে ঐক্য এবং ভ্রাতৃত্ব", মাযাহিবে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, সংখ্যা- ১৮, সাল ২০০৪।
১৫ - ইসলামের ইতিহাস, মাহদি পিশভায়ী, পৃ. ২৫।
১৬ - সূরা হুজুরাত, আয়াত নং ১০।
১৭ - ইসলামের ইতিহাস থেকে উদ্ধৃতি, জাফর সুবহানী, পৃ. ২১৪।
১৮ - তাক্‌রিব ম্যাগাজিন, পৃ. ৬৩।
১৯ - কানযুল উম্মাল, খণ্ড ১, পৃ. ১৪৯।
২০ - উসুলে কাফি, খণ্ড ১, পৃ. ১৪৯।
২১ - উদ্ধৃত: আবুল-ফুতুহ রাযী, তফসির রহুল জিনান, খণ্ড ১, পৃ. ১৫৯।

# হযরত ফাতেমা যাহরা (সা. আ.) : নারীর সর্বোত্তম আদর্শ

শাহনাজ আরফিন

মুসলিম নারীদের জন্য অনুসরণীয় ও আদর্শ কোনো নারীকে খুঁজতে গেলে সর্বপ্রথমেই যাঁর কথা মনে পড়ে তিনি হলেন এমন এক অসাধারণ নারী যাঁর আবির্ভাবে পৃথিবী বেহেশতের সুবাতাসে আন্দোলিত হয়েছিল। হ্যাঁ, তিনি হলেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর চোখের মণি, কলিজার টুকরা ফাতেমা যাহরা সালামুল্লাহি আলাইহা। যিনি ছিলেন রাসূলে খোদার শিক্ষা ও আদর্শের অনুপম প্রতিচ্ছবি। তিনি এ পৃথিবীতে এসেছিলেন বেহেশতের খুশবু নিয়ে। তাঁর নূরের আভায় পৃথিবী হয় আলোকিত।

পৃথিবী এ ক্ষণজন্মা মহীয়সী নারী সম্পর্কে খুব কমই জানে। হযরত ফাতেমা (সা. আ.)-এর ব্যক্তিত্ব ও তাঁর সুমহান মর্যাদা সম্পর্কে

বলে শেষ করা কঠিন কাজ।

ইসলামি ইরানের সম্মানিত নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন সময় তাঁদের ভাষণ ও বাণীতে হযরত ফাতেমা যাহরা সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন, মানব ইতিহাসের প্রতিটি জনগোষ্ঠী ও সমাজেই বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কোনো না কোনো ব্যক্তিত্বকে অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে দেখা যায়– যিনি তাদেরকে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। মহান স্রষ্টা তাঁর শেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে যাঁকে বিশ্বের নারীকুলের জন্য আদর্শ হিসেবে পেশ করেছেন তিনি হলেন হযরত ফাতেমা যাহরা।

তাই বর্তমান সময়ে হযরত ফাতেমার জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে যতই আলোচনা করা হবে তা মুসলমান নারীদের জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে।

হযরত ফাতেমা যাহরা ছিলেন রাসূলে খোদা (সা.)-এর সবচেয়ে কাছের ও আদরের প্রিয়তম কন্যা। রাসূল খোদা তাঁর সম্পর্কে বলেছেন :

...ابنَتی فاطمةُ سيّدةُ نِساءِ العالَمينَ

আমার কন্যা ফাতেমা জগতসমূহের নারীদের নেত্রী। সে আমার দেহের অংশ, আমার চেখের আলো, আমার আত্মার ফসল, আমার বক্ষের মধ্যে আমার প্রাণ। মানবকুলের সুন্দর আদর্শ। সে যখন তার মেহরাবে রবের সামনে নামাজে দাঁড়ায় তখন তার নূর আকাশের ফেরেশতাদেরকে আলোকিত করে, যেভাবে আকাশের নক্ষত্র পৃথিবীকে আলোকিত করে।

এখানে উল্লেখ্য যে, فاطمة بضعة منى 'ফাতেমা আমার দেহের অংশস্বরূপ'– এ হাদিসের মূল শিক্ষা হচ্ছে হযরত ফাতেমা (সা. আ.) শারীরিক ও আত্মিক উভয় দিক থেকেই রাসূলে খোদা (সা.)-এর পবিত্র অস্তিত্বের অংশবিশেষ। মহানবী যেমন মানবকুলের জন্য উত্তম আদর্শ, তেমনিভাবে আহলে বাইতের অন্যতম সম্মানিত সদস্য হযরত ফাতেমা (সা.) সমগ্র নারী জাতির আদর্শ।

অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, হযরত ফাতেমা রাসূলে করীম (সা.)-এর নবুওয়াতের পঞ্চম বছর ২২ মতান্তরে ২০শে জমাদিউস সানি তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত ফাতেমার জন্মগ্রহণের কথা ইমাম জাফর সাদেক (আ.) এভাবে বর্ণনা করেছেন : হযরত খাদিজা (সা. আ.) রাসূলে খোদার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর মক্কার নারীরা তাঁর সাথে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে। হযরত খাদিজা তাঁর গর্ভের সন্তানের সাথেই কথা বলতেন ও সময় অতিবাহিত করতেন। প্রসবের সময় ঘনিয়ে এলে হযরত খাদিজা দেখতে পান যে, চারজন বেহেশতি নারী তাঁর সাহায্যের জন্য উপস্থিত হয়েছেন। তাঁরা হলেন, (১) বিবি সারা, হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর স্ত্রী, (২) বিবি মারইয়াম, হযরত ঈসা (আ.)-এর মা, (৩) বিবি আসিয়া, ফিরআউনের স্ত্রী এবং (৪) উম্মে কুলসুম, হযরত মূসা (আ.)-এর বোন। তাঁদের সাহায্য ও উপস্থিতিতেই জন্মগ্রহণ করেন হযরত ফাতেমা (সা. আ.)। তাঁর নূরে মক্কার সব গৃহ হয় আলোকিত।

হযরত ফাতেমা ছিলেন নবী করীম (সা.)-কে আল্লাহর প্রদত্ত বিশেষ উপহার। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছেন:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (১) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (২) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ (৩)

'(হে রাসূল!) নিশ্চয় আমি তোমাকে কাউসার দান করেছি। সুতরাং তোমার প্রভুর প্রার্থনা করো ও কুরবানি দাও। নিশ্চয় তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীরাই লেজকাটা (নির্বংশ)।'

সূরা কাউসারের তাফসীরে অধিকাংশ মুফাসসির মনে করেন যে, এখানে 'কাউসার' বলতে হযরত ফাতেমা (সা. আ.)-কেই বোঝানো হয়েছে। আর এ সূরার শানে নুযুল থেকেও এটাই বোঝা যায়। হযরত ফাতেমার মাধ্যমে রাসূলে খোদার বংশধারা অব্যাহত থাকাকে তাঁরা এ সূরায় বর্ণিত 'কাউসার' (অফুরন্ত কল্যাণ) শব্দের দৃষ্টান্ত বলে উল্লেখ করেছেন।

পৃথিবীতে মহিলাদের যখন মানুষ হিসেবে গণ্য করা হতো না, তখন ফাতিমা যাহরার জন্ম হয়। রাসূলে আকরাম (সা.) নিজ কন্যার জন্মগ্রহণকে অত্যন্ত আনন্দের সাথে বরণ করেছিলেন।

সে সময় আরব উপদ্বীপে কিংবা সমকালীন বিশ্বের অন্যান্য জায়গায় নারীর অধিকার এবং উত্তরাধিকার কোনোটাই স্বীকার করা হতো না। অথচ ইসলাম রাসূলের কন্যা ফাতেমার মাধ্যমে নিকৃষ্ট সেই সমস্ত কুসংস্কার ও প্রথার পরিবর্তন করে এক অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল।

**সূরা কাউসারের তাফসীরে অধিকাংশ মুফাসসির মনে করেন যে, এখানে 'কাউসার' বলতে হযরত ফাতেমা (সা. আ.)-কেই বোঝানো হয়েছে। আর এ সূরার শানে নুযুল থেকেও এটাই বোঝা যায়। হযরত ফাতেমার মাধ্যমে রাসূলে খোদার বংশধারা অব্যাহত থাকাকে তাঁরা এ সূরায় বর্ণিত 'কাউসার' (অফুরন্ত কল্যাণ) শব্দের দৃষ্টান্ত বলে উল্লেখ করেছেন।**

## হযরত ফাতেমার নামকরণ

মহান আল্লাহর নির্দেশে মহানবী (সা.) তাঁর কন্যাসন্তানের নাম রাখেন ফাতেমা। 'ফাতম' শব্দের অর্থ রক্ষা করা। আর তাঁর এমন নামকরণ সম্পর্কে মহানবী বলেন : 'তার নামকরণ করা হয়েছে ফাতেমা, কেননা, আল্লাহ তাকে ও তার অনুসারীদের জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত রেখেছেন।'

হযরত ফাতেমা (সা. আ.) তাঁর বিশেষ বিশেষ গুণের জন্য বিশেষ নামের অধিকারিণী ছিলেন। তাঁর অপর নামগুলো হচ্ছে- 'সিদ্দিকা' অর্থাৎ সত্যবাদী; 'তাহেরা' অর্থাৎ পবিত্র, 'যাহরা' অর্থাৎ আলোকিত, 'রাজিয়া' অর্থাৎ সন্তুষ্ট, 'মার্জিয়া' অর্থাৎ সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত।

হযরত ফাতেমা (সা. আ.) সম্পর্কে বিশ্বনবীর অসংখ্য বাণী আমাদেরকে ক্ষণজন্মা এ মহীয়সী নারীর সম্মান ও মর্যাদা উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। নবীপত্নী হযরত আয়েশা থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে, যখন ফাতেমা পিতার কাছে আসতেন, তখন রাসূল তাঁকে স্বাগত জানাতেন এবং তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে যেতেন। তাঁর হাতে চুমু দিতেন এবং তাঁকে নিজ আসনে বসাতেন।

এখানে প্রশ্ন জাগে, হযরত ফাতেমা সম্পর্কে নবী করীমের বাণীগুলো কি একজন কন্যার প্রতি পিতার স্বাভাবিক ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ মাত্র?

এই প্রশ্নের উত্তর আমরা নবী করীম (সা.)-এর অন্যান্য বাণীতে খুঁজে পাই। নবী করীম (সা.) তাঁর এক বাণীতে বলেছেন :

ابنتى فاطمة حوراء آدمية ... وانما سمها فاطمة لان الله عز و جل فطمها و محبيها من النار

"আমার মেয়ে ফাতেমা মানসরূপী হুর। ... আর তার নাম রাখা হয়েছে 'ফাতিমা'। কেননা, তার উসিলায় আল্লাহ তার প্রতি ভালোবাসা পোষণকারীদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।"

অন্য একটি হাদিসে রাসূলে খোদা (সা.) বলেছেন :

يا فاطمة ! ان الله ليغضب لغضبک ويرضى لرضاک

'হে ফাতেমা! মহান আল্লাহ তোমার ক্ষোভে অসন্তুষ্ট হন এবং তোমার খুশিতে আনন্দিত হন।'

বস্তুত মা ফাতেমার চরিত্রে বিকশিত হয়েছে ঐশী গুণাবলি, স্রষ্টার মহত্ত্ব ও বিশালতা। মা ফাতেমা স্রষ্টার গভীর আনুগত্যের মাধ্যমে আত্মিক উৎকর্ষ ও আধ্যাত্মিকতার এত উঁচু স্তরে পৌঁছেছেন।

হযরত ফাতেমার পুরো অস্তিত্বে রয়েছে খোদার নূরের ঝলকানি। তিনি এক মুহূর্তের জন্য সত্য বা ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত হননি।

আর এ জন্যই রাসূলে খোদা (সা.) তাঁর সবটুকু আবেগ ও অনুভূতি উজাড় করে ফাতেমার প্রতি তাঁর স্নেহ ও ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন এবং তাঁকে বিশ্বের নারীদের জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় আদর্শ বলে মন্তব্য করেছেন।

মহীয়সী এ নারীর জীবনকাল খুবই সংক্ষিপ্ত হলেও এর ব্যাপ্তি অনেক বেশি। তাঁর এ স্বল্পকালীন ঘটনাবহুল জীবনে আমরা তাঁকে দেখতে পাই বিভিন্ন চরিত্রে। পরম প্রিয় পিতা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ, হযরত আলী (আ.)-এর পাশে স্বামীপরায়ণা স্ত্রী, সন্তানদের জন্য মমতাময়ী মা, যুদ্ধের ময়দানে আহতদের জন্য সেবিকা, কিংবা দ্বীন রক্ষার ক্ষেত্রে আপোসহীন সংগ্রামী, আবার নারী মুক্তির দিশা ইত্যাদি অসংখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন তিনি। তাঁর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ক্ষণস্থায়ী জীবনের সব ক্ষেত্রেই তিনি আদর্শ নারী হিসেবে যথাযথ ভূমিকা পালন করেছেন।

## আদর্শ কন্যা ও পিতার সেবায়

ছোট বেলাতেই মা খাদিজাকে হারান তিনি। হযরত খাদিজা (সা. আ.)-এর ইন্তেকালের পর হযরত ফাতেমা সুখে-দুঃখে সংগ্রামে সর্বাবস্থায় ছায়ার মতো নবী করীম (সা.)-এর পাশে ছিলেন। তিনি ছিলেন রাসূলে খোদার একান্ত বিশ্বস্ত আপনজন ও শক্তি-প্রেরণার উৎস। রাসূলে খোদার (সা.) জীবনে এই ছোট্ট কন্যাটি সে সময়ে তাঁর সান্ত্বনা ও সুখ-দুঃখের আধার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিলেন। বাবার সেবা করে তিনি যেন অন্যরকম এক তৃপ্তি

পেতেন। তিন বছর গোপনে দ্বীনি দাওয়াতের পর যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর প্রিয় হাবিবকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দেবার নির্দেশ দিলেন, তখন প্রিয় নবীর উপর মুশরিকদের অত্যাচার অনেক বেড়ে যায়। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে, একবার রাসূলে খোদা (সা.) কাবা ঘরের পাশে নামাজ আদায় করছিলেন। রাসূল (সা.) যখন সিজদাবনত হন, আবু জেহেল ও তাঁর কতিপয় দোসর তখন তার পিঠের উপর সদ্য প্রসব করা উটের নাড়িভুঁড়ি নিক্ষেপ করে ও অট্টহাসি দেয়। হযরত ফাতেমা তখন অল্পবয়সী কন্যা। খবর পেয়ে তিনি দ্রুত সেখানে আসেন এবং পরম মমতার সাথে নিজের ছোট হাতে পিতার মাথা, শরীর পরিষ্কার করেন। সাথে সাথে আবু জেহেল ও তার দোসরদের কঠোরভাবে তিরস্কার করেন।

এভাবে রাসূলে খোদাকে কাফিরদের নির্যাতন থেকে রক্ষা করার জন্য সবার আগে ফাতেমাই এগিয়ে যেতেন তাঁর দায়িত্ববোধের কারণে। এ কারণে খোদ নবীজি তাঁকে 'উম্মে আবিহা' বা 'তাঁর পিতার মা' বলে উল্লেখ করেছেন। সমাজের অন্যান্য শিশু শৈশবে যেভাবে আরাম-আয়েশ ও যত্নের সাথে বেড়ে ওঠে হযরত ফাতেমা সেভাবে বেড়ে ওঠার সুযোগ পাননি। শেব-ই-আবু তালিবে অবরুদ্ধ অবস্থায় কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার শিক্ষা তাঁকে পরবর্তীকালে সমাজের নানামুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পারঙ্গম হয়ে উঠতে সাহায্য করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মহান আল্লাহ অতি শৈশব থেকে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, মেধা, সাহসিকতা ও বাগ্মিতা দিয়ে তাঁকে ভবিষ্যতের দায়িত্ব পালনের উপযোগী করে গড়ে তুলেছিলেন।

হযরত ফাতেমা ছিলেন সত্যিকার অর্থে একজন সত্যনিষ্ঠ নারী। তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত অথচ বরকতময় জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে রাসূলে খোদার জীবনের সাথে একাত্ম করেছিলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ভালোবাসার খাতিরে। তিনি ছিলেন মানুষের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র, ত্যাগী মনোভাবের। খাইবার যুদ্ধের পর রাসূলে খোদা (সা.) আল্লাহর নির্দেশে হযরত ফাতিমা (সালামুল্লাহ আলাইহা)-কে 'ফাদাক' নামক একটি আঙ্গুর বাগান উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন। সে বাগানের আয় ছিল সে যুগে মাসিক প্রায় ৩ লক্ষ দিনার। তিনি সেই সব অর্থ দুর্বল, অনাথ, অভুক্ত, দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের জন্য ব্যয় করতেন।

## আদর্শ জননী

একজন নারীর জন্য সর্বোচ্চ গৌরব ও মর্যাদার স্তর হচ্ছে মায়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া। আধুনিক শিক্ষার জনকরাই বলেছেন, 'আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও, আমি শিক্ষিত জাতি দেব।' ইসলামে নারী সমাজ তথা মায়ের জাতিকে প্রত্যেক সন্তানের জন্য প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ মাতৃক্রোড়ই শিশুর জন্য প্রথম বিদ্যানিকেতন হিসেবে চিহ্নিত করেছে। মায়ের শিখানো বিষয়গুলোই প্রতিটি সন্তান বড় হয়ে বাস্তব জীবনে প্রতিফলন ঘটায়। এরই আলোকে বলা যায়, হযরত ফাতেমা নিজ সন্তানদেরকে উত্তম শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে ছোট বেলা থেকেই ধর্মীয় জ্ঞান, আদব-কায়দা ও নীতি-নৈতিকতা শেখানোর জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তাদের সাথে শিশুসুলভ আচরণ করতেন এবং খেলাও করতেন। তিনি নিজ হাতে সন্তানদের লালন-পালন করতেন এবং ঐশী আদর্শে তাদেরকে গড়ে তোলেন।

তাঁর প্রতিটি সন্তান মানব ইতিহাসের এক একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রস্বরূপ। এক কথায় বলা যায়, হযরত ফাতেমা ছিলেন ইমাম হাসান, ইমাম হোসাইন ও বিবি যয়নাব (সা. আ.)-এর মতো আদর্শ সন্তানদের আদর্শ জননী।

## ইবাদত ও ধর্মীয় ভূমিকা

হযরত ফাতেমা ছিলেন অত্যন্ত পরহেযগার ও ধার্মিক নারী। তিনি ইবাদতের ক্ষেত্রে নিজ পিতাকে অনুসরণ করতেন। আর তাইতো হাসান বসরি (র.) বলেছেন : 'নবী (সা.)-এর উম্মতের মধ্যে হযরত ফাতেমার মতো ইবাদতকারী খুঁজে পাওয়া যাবে না। তিনি এত অধিক পরিমাণে ইবাদত করতেন যে, তাঁর পা দাঁড়িয়ে থাকার কারণে ফুলে যেত।'

ইমাম জাফর সাদেক (আ.) ইমাম হাসান (আ.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 'এক জুমআর রাতে আমার মাকে সকাল পর্যন্ত ইবাদত করতে দেখলাম। নামাজ আদায় শেষে তিনি দোয়া করছিলেন, শুনলাম তিনি একে একে বহু মানুষের নাম নিয়ে দোয়া করছেন, নিজের জন্য কিছুই প্রার্থনা করলেন না। নামাজ শেষ হবার পর মাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মা, যেভাবে অন্যের জন্য দোয়া করলেন, নিজের জন্য তো কিছুই চাইলেন না?' উত্তরে মা ফাতেমা ছেলেকে বললেন : الجار ثم الدار অর্থাৎ সবসময় প্রতিবেশীদের অগ্রাধিকার দিতে হয়, অতঃপর নিজেকে।

একটি বর্ণনায় এসেছে যে, 'মহান আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাদের

ডেকে বলছেন : আমার বান্দা ফাতেমার দিকে তাকিয়ে দেখ এমনভাবে আমার সামনে দণ্ডায়মান হয়েছে যে, আমার ভয়ে তার সর্বাঙ্গ কাঁপছে তথাপি সে অন্তর দিয়ে আমার ইবাদত করছে।'

**নৈতিক বৈশিষ্ট্য**

হযরত ফাতেমা (সা. আ.) ছিলেন নৈতিক আদর্শে সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি দয়া, দানশীলতা, ধৈর্য, উদারতা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও সাহসিকতার অনুপম প্রতিচ্ছবি।

ইবনে জাওযি লিখেছেন, ফাতেমার বিয়ের অনুষ্ঠানের দিন এক ফকির এসে তাঁর কাছে জামা-কাপড় চায়। কুরআনের আয়াতের কথা স্মরণ করে মা ফাতেমা তাঁর বিয়ের জামা-কাপড় খুশিমনে ফকিরকে দান করে দেন।

হিজরতের পর অত্যন্ত আড়ম্বরহীনভাবে ইমাম আলী (আ.)-এর সাথে হযরত ফাতেমার বিয়ে হয়। বিয়ের পর রাসূলে খোদা ইমাম আলীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন : 'হে আলী! তোমার স্ত্রীকে কেমন পেলে?' জবাবে ইমাম আলী বলেছিলেন : 'মহান আল্লাহর ইবাদতের জন্য আমি একজন উত্তম সঙ্গী পেয়েছি।'

হযরত ফাতেমার ব্যক্তিগত জীবন ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে। কাপড়-চোপড়, জীবন-ধারণ সবকিছুতেই তিনি ছিলেন সে যুগের অন্যান্য সমপর্যায়ের মহিলার চেয়ে আলাদা। হযরত ফাতেমা (সা. আ.) দরিদ্র ও অভাবীদের প্রয়োজন পূরণের ব্যাপারেও খুবই যত্নবান ছিলেন।

এমন ঘটনাও ঘটেছে যে, নিজেদের জন্য তৈরি করা খাবার অভাবী লোককে দান করে তিনি ও তাঁর স্বামী হযরত আলী (আ.) দুজনেই না খেয়ে রাত কাটিয়েছেন।

মদিনার নারী সমাজ ধর্মীয় বিষয়সহ নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য মা ফাতেমার কাছে যেতেন। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে তাঁদের সকল প্রশ্নের জবাব দিতেন।

মক্কার মুশরিকদের বিরুদ্ধে ওহুদ যুদ্ধের ময়দানে হযরত ফাতেমার বীরত্বপূর্ণ ও সাহসী ভূমিকা ইসলামে নারীর রাজনীতি ও জিহাদের ময়দানে অংশগ্রহণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পরবর্তীকালে রাসূলে খোদার ওফাতের পর মুসলমানদের মাঝে সৃষ্ট বিচ্যুতির মোকাবেলায় হযরত ফাতেমা অত্যন্ত কঠোর ও ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তিনি আদৌ নিষ্ক্রিয় ও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেননি; বরং তিনি এটাকে মহানবীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও কষ্টের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যৎ ভাগ্যের সাথে জড়িত একটি বিষয় হিসেবেই দেখেছেন। এ কারণে তিনি মসজিদে নববিতে গিয়ে এক ঐতিহাসিক খুতবা প্রদানের মাধ্যমে মুসলমানদের অবহিত ও জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন।

পরিশেষে বলা যায়, নবীনন্দিনী ফাতেমা যাহরা (সা. আ.) এ পৃথিবীতে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের যথোপযুক্ত ব্যবহার করেছেন। তাঁর পুরো জীবনটাই হচ্ছে আলোকিত ও শিক্ষণীয়। তিনি নিজের যাবতীয় শক্তি, যোগ্যতা ও প্রতিভাকে আল্লাহর নির্দেশিত পথে পরিচালিত করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আজকের নারী সমাজ যদি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে হযরত ফাতেমার জীবনাদর্শ অনুসরণ করে, নিঃসন্দেহে তারা শান্তি, মুক্তি ও অপার কল্যাণের অধিকারী হতে পারবে।

লেখক : শিক্ষক ও গবেষক


## নিউজ লেটারের গ্রাহক বিজ্ঞপ্তি

সম্মানিত গ্রাহকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, নিউজ লেটার নিয়মিত পেতে হলে ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বরাবর ১ বছরের গ্রাহক চাঁদা বাবদ ২০০ (দুইশত) টাকা +৮৮০ ১৯২৪-৭৩৩১৮৩ নাম্বারে বিকাশ করে পিন নাম্বারসহ নিউজলেটার পাওয়ার ঠিকানাটি +৮৮০ ১৯২৪-৭৩৩১৮৩ নাম্বারে এস এম এস করতে হবে।

**যোগাযোগের সময়**

**সকাল ৯টা - বিকাল ৫টা (রবি-বৃহঃবার)**

**সার্কুলেশন বিভাগ, নিউজলেটার**

বাড়ি নং-৭, রোড নং-১১ (পুরনো ৩২)
ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯।

**মোবাইল: +৮৮০১৯২৪-৭৩৩১৮৩**

## ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ওয়েবসাইট

**ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ওয়েবসাইট দেখুন**
www.iranmirrorbd.com,
https://bn.icro.ir/Dhaka|
https://www.instagram.com/iran_cultural_center_dhaka/ (সোশ্যাল মিডিয়া)

এতে রয়েছে ইরানের শিল্প, সাহিত্য, সমাজ -সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থানসহ নানা তথ্য। তাছাড়া থাকছে ফারসি ভাষা শিক্ষা, পবিত্র কুরআন, হাদিস ও ইসলামী দর্শনসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধসমূহ। কাজেই আর দেরি না করে ভিজিট করুন এ দু'টি ওয়েবসাইট ও সোশ্যাল মিডিয়া।

# শহিদ সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহ: ইসলামি প্রতিরোধের পতাকাবাহী

**রাশিদুল ইসলাম**

শুধু মাতৃভূমি লেবানন নয়, মুসলমানদের পুণ্যভূমি ফিলিস্তিনকে মুক্ত করার পবিত্র সংগ্রামে যাঁর অবদান ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে তিনি হলেন লেবাননের ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন হিযবুল্লাহর মহাসচিব সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহ। লেবাননের রাজধানী বৈরুতের দক্ষিণ উপকণ্ঠে গত ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪, শুক্রবার ইহুদিবাদী ইসরাইলি বাহিনীর বর্বরোচিত বিমান হামলায় এই মহান সংগ্রামী নেতা শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেছেন। তার তাঁর শাহাদাতের পর হিযবুল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। এতে বলা হয় 'সুতরাং যারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবনকে বিক্রয় করে তাদের আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা উচিত। বস্তুত যে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করবে, অতঃপর সে নিহত হবে অথবা বিজয়ী, আমি তাকে শীঘ্রই মহাপুরস্কার দান করব।' [সূরা নিসাঃ আয়াত ৭৪]

আমাদের মহান শিক্ষক, প্রতিরোধ আন্দোলনের পথিকৃৎ, আল্লাহর একনিষ্ঠ সৎ বান্দা, সাহসী নেতা, প্রজ্ঞাবান ঈমানদার, দূরদর্শী ও মুমিন সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে শাহাদাতের সুমহান কাফেলায় যোগ দিয়েছেন।

লেবাননের হিযবুল্লাহ মহাসচিব সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহ শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করার মাধ্যমে নিজের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে গেছেন। তিনি প্রায় ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে শহিদদের পথ ধরে অগ্রসর হয়েছেন এবং এই দীর্ঘ সময়ে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের একের পর এক বিজয় উপহার দিয়েছেন। তিনি ১৯৯২ সালে প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতৃত্বের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২০০০ সালে ইহুদিবাদীদের কবল থেকে লেবাননের মুক্তি থেকে শুরু করে ২০০৬ সালের ৩৩ দিনের যুদ্ধে ইসরাইলের বিরুদ্ধে বিজয় তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে অর্জিত হয়েছে। গত প্রায় এক বছর ধরে গাজার নির্যাতিত ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি সংহতি জানিয়ে তিনিই লেবাননের প্রতিরোধ আন্দোলনকে ইসরাইলবিরোধী সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন।

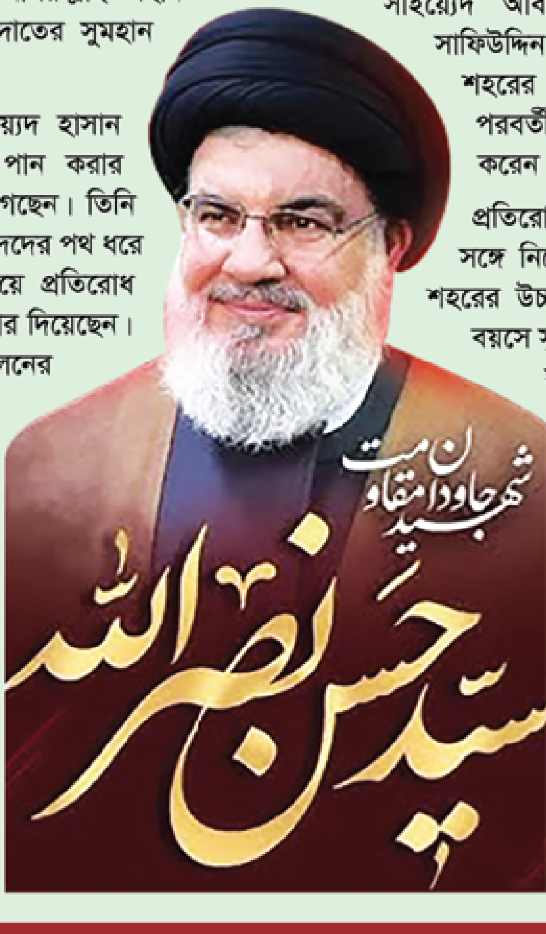


সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহ লেবাননের হিযবুল্লাহর তৃতীয় মহাসচিব। ১৯৮২ সালে হিযবুল্লাহ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ১৯৯২ সালে ইহুদিবাদী ইসরাইল হিযবুল্লাহর দ্বিতীয় মহাসচিব সাইয়্যেদ আব্বাস মুসাভিকে শহিদ করার পর দলের হাল ধরেন সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহ।

সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহর নেতৃত্বে হিযবুল্লাহ আঞ্চলিক শক্তিতে পরিণত হয়। নাসরুল্লাহর নেতৃত্বাধীন হিযবুল্লাহ ইসরাইলের বিরুদ্ধে বহু সফল অভিযান পরিচালনা করতে সক্ষম হয়, এর ফলে ২০০০ সালে ইসরাইলি বাহিনী লেবানন থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়। ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহিল উজমা খামেনেয়ী এই সংগ্রামীকে একজন মহান মুজাহিদ, নেতা এবং প্রতিরোধের প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

লেবানন তথা গোটা বিশ্বের পরিচিত মুখ সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহ ১৯৬০ সালের ৩১ আগস্ট পূর্ব বৈরুতে জন্মগ্রহণ করেন। নয় ভাইবোনের মধ্যে তিনি সবার বড়। তাঁর বাবা সাইয়্যেদ আবদুল করিম এবং মা নাহদিয়া সাফিউদ্দিন ছিলেন দক্ষিণ লেবাননের সুর শহরের বাজুরিয়েহ গ্রামের বাসিন্দা। পরবর্তীকালে তাঁরা বৈরুতে বসবাস শুরু করেন।

প্রতিরোধের নেতা ১৯৭৫ সালে পরিবারের সঙ্গে নিজেদের গ্রামে ফিরে যান এবং সুর শহরের উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৬ বছর বয়সে সুর শহরের জুমআর নামাজের ইমাম সাইয়্যেদ মোহাম্মদ গারাভি এবং প্রখ্যাত ইরাকি চিন্তাবিদ ও আইনশাস্ত্রবিদ আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ বাকের সাদ্‌রের বন্ধুদের অনুপ্রেরণায় সাইয়্যেদ নাসরুল্লাহ ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনের জন্য ইরাকের নাজাফে যান। তাঁরা শহিদ সাদ্‌রের কাছে একটি চিঠি লিখে সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। এরপর শহিদ আয়াতুল্লাহ সাদ্‌র এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেন এবং

সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহর লেখাপড়াসহ বিভিন্ন দিক দেখভাল করার দায়িত্ব পান শহিদ সাইয়্যেদ আব্বাস মুসাভি।

১৯৭৮ সালে সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহ নাজাফে ধর্মীয় বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন এবং ইরাকের বাথ সরকারের চাপের কারণে দুই বছর পরই লেবাননের উদ্দেশ্যে নাজাফ ত্যাগ করেন। লেবাননের বালবেকে 'ইমাম মুন্তাযার ধর্মীয় শিক্ষা কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি সেখানে ধর্মীয় পড়ালেখা চালিয়ে যান। একই সঙ্গে সেখানে তিনি শিক্ষকতাও করতেন। সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহ ১৯৭৮ সালে ১৮ বছর বয়সে ফাতিমা ইয়াসিনকে বিয়ে করেন। তাঁদের ঘর উজ্জ্বল করে জন্ম নেয় চার ছেলে ও এক মেয়ে। তাঁদের প্রথম সন্তানের নাম সাইয়্যেদ হাদি। ১৯৯৭ সালে দক্ষিণ লেবাননে দখলদার ইসরাইলি সেনাদের সাথে সংঘর্ষের সময় সাইয়্যেদ হাদি শহিদ হন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ১৮ বছর।

সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহ তাঁর যৌবনের প্রথম থেকেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রবেশ করেন। ইরান থেকে লেবাননে যাওয়া প্রখ্যাত আলেম ও চিন্তাবিদ ইমাম মুসা সাদ্‌রের প্রতি ভক্তির কারণে তিনি তাঁর আন্দোলনে যোগ দেন। ইমাম মুসা সাদ্‌র লেবাননের শিয়াদের সুপ্রিম অ্যাসেম্বলি এবং আমাল আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বিভিন্ন ধর্ম ও মাজহাবের মধ্যে ঐক্য ও সহাবস্থান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ইমাম মুসা সাদ্‌র বড় ভূমিকা রাখেন। সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহ তাঁর ভাই সাইয়্যেদ হোসাইনকে নিয়ে তাঁদের গ্রামে আমাল আন্দোলনের নেতৃত্বে দেন। আমাল আন্দোলন লেবাননের জনগণকে রক্ষায় এবং দখলদার ইসরাইলকে সামরিকভাবে মোকাবেলা করার জন্য গঠিত হয়েছিল।

১৯৮২ সালে লেবাননে ইসরাইলি হামলার পর একদল সংগ্রামী আলেমের পাশাপাশি সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহও আমাল মুভমেন্ট থেকে আলাদা হয়ে যান এবং আরও সক্রিয় সংগ্রামের লক্ষ্যে ইসরাইলবিরোধী ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন হিযবুল্লাহ প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৮২ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহ হিযবুল্লাহকে শক্তিশালী ভিত্তির উপর গড়ে তোলার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। হিযবুল্লাহর কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে থাকার পাশাপাশি তিনি লেবাননে ইহুদিবাদী ইসরাইলের দখলদারিত্ব মোকাবেলায় প্রতিরোধ বাহিনী গঠন এবং বিভিন্ন সামরিক ইউনিট প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করেন। কিছু দিন বৈরুতে হিযবুল্লাহর প্রধান ইবরাহিম আমিন আল সাঈদের ডেপুটি হিসেবে কাজ করেন। এরপর তিনি হিযবুল্লাহর নির্বাহী উপপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

দখলদার ইসরাইল হিযবুল্লাহর দ্বিতীয় মহাসচিব সাইয়্যেদ আব্বাস মুসাভিকে শহিদ করার পর ১৯৯২ সালে সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহ সংগঠনের কেন্দ্রীয় পরিষদের মাধ্যমে মহাসচিব হিসেবে নির্বাচিত হন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৩২ বছর। মহাসচিবের দায়িত্ব পালনকালে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেন এই মহান সংগ্রামী। তাঁর নেতৃত্বে লেবাননের হিযবুল্লাহ ইসরাইলের বিরুদ্ধে নানা বিজয়ের পাশাপাশি তাকফিরি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধেও বড় বিজয় পায়। ২০০০ সালে দক্ষিণ লেবাননকে ইসরাইলের কাছ থেকে দখলমুক্ত করা, ২০০৬ সালে ৩৩ দিনের যুদ্ধে অভাবনীয় বিজয় এবং

ইরাক ও সিরিয়ায় অবৈধ আইএস সরকারের পতন মহাসচিব নাসরুল্লাহর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সাফল্য।

সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহ যে মধ্যপ্রাচ্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন তা হচ্ছে সন্ত্রাসবাদমুক্ত এবং রাজনীতি ও অর্থনীতিসহ সফল দেশ গড়ার কৌশল ও নিয়ন্ত্রণ আয়ত্তে রাখা। প্রচলিত রাজনীতি, সমাজ ও আগ্রাসী শক্তির বিপরীতে সমরনায়ক বলতে যা বুঝায় তা কিন্তু ছিলেন না সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহ। বস্তুত আধ্যাত্মিক শক্তি বা রুহানি শক্তির বলে বলীয়ান হয়ে আত্মত্যাগের চরম নজির স্থাপন করে গেছেন তিনি। পরাশক্তির মতো দেশগুলো, যেমন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র ইসরাইল মধ্যপ্রাচ্য থেকে শুরু করে বিশ্বের সর্বত্র যুদ্ধ ও লুণ্ঠনের রাজনীতি চালু রেখে যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন দেশে যে দাসত্ব ও নতজানু শাসন ও পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছে তার বিপরীতে ঐশী শক্তির প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বাসের সঙ্গে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে খোদায়ী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় শোষণ ও বৈষম্যবিরোধী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ছিল হাসান নাসরুল্লাহর ঐতিহাসিক রাজনৈতিক পরিক্রমা। কিন্তু হাসান নাসরুল্লাহর এই রাজনৈতিক পরিক্রমা জারি থাকলে মধ্যপ্রাচ্যে পরাশক্তি দেশগুলোর লুণ্ঠন ও নতজানু শাসকের তখতে তাউস অবশিষ্ট থাকে না। সেটা লেবাননের অস্তিত্ব হোক আর ফিলিস্তিনিদের মুক্তিকামী জনতার বিজয় হোক। এ কারণেই হিযবুল্লাহর শীর্ষ নেতাদের একের পর এক হত্যার মতো ঘৃণ্য পথ বেছে নিয়েছে ইসরাইল। কিন্তু হাসান নাসরুল্লাহর দেখানো মুক্তির পথ ও শহিদি কাফেলায় শামিল হয়ে সংগ্রাম জারি রাখতে নেতৃত্ব কিংবা বীর সেনানীর অভাব হচ্ছে না। হবারও নয়। এখানেই হাসান নাসরুল্লাহদের জীবন, সংগ্রাম ও ত্যাগের সার্থকতা। জেনারেল কাসেম সোলায়মানি যেমন মার্কিন পরাশক্তির সাজানো আইএস জঙ্গিদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন সারা দুনিয়া থেকে তেমনি সহযোদ্ধা হিসেবে নাসরুল্লাহ দেখিয়ে গেছেন ফিলিস্তিন তথা বিশ্বমুসলিমের জন্য সংগ্রামের পথ ও লক্ষ্যমাত্রা।

শতাব্দীর সেরা সংগ্রামীর জীবন এবং শত্রুদের ব্যর্থতার ইতিহাসের দিকে নজর দিলে তা পরিষ্কার হয়ে ওঠে। একারণেই হিযবুল্লাহর প্রধান নাসরুল্লাহর শাহাদাত ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলনকে আরো বেগবান করেছে। তিনি কেবল হিযবুল্লাহ-র নেতৃত্বই দেননি, বরং তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে লেবাননের রাজনীতিতে এক শীর্ষ তাত্ত্বিক নেতা ও ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে হিযবুল্লাহ আঞ্চলিক শক্তিতে পরিণত হয় এবং তাঁর পথ অনুসরণ করেই মধ্যপ্রাচ্যে আজ এক শক্তিশালী প্রতিরোধ অক্ষ তৈরি হয়েছে। যে প্রতিরোধ অক্ষের দুর্বার আন্দোলন ইহুদিবাদী ইসরাইলের ভীতকে নাড়িয়ে দিয়েছে। স্বপ্ন দেখাচ্ছে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠাসহ নয়া বিশ্ব ইসলামি বিশ্বের।

**হিযবুল্লাহর প্রধান হাসান নাসরুল্লাহর কেবল হিযবুল্লাহ-র নেতৃত্বই দেননি, বরং তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে লেবাননের রাজনীতিতে এক শীর্ষ তাত্ত্বিক নেতা ও ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে হিযবুল্লাহ আঞ্চলিক শক্তিতে পরিণত হয় এবং তাঁর পথ অনুসরণ করেই মধ্যপ্রাচ্যে আজ এক শক্তিশালী প্রতিরোধ অক্ষ তৈরি হয়েছে। যে প্রতিরোধ অক্ষের দুর্বার আন্দোলন ইহুদিবাদী ইসরাইলের ভীতকে নাড়িয়ে দিয়েছে।**

নাসরুল্লাহকে হত্যা করে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু চেয়েছিল এই 'অঞ্চলে ক্ষমতার ভারসাম্যে পরিবর্তন' ঘটানো।

ইসরাইলের জন্য আঞ্চলিক ক্ষমতার ভারসাম্য বদল হওয়ার মানে হলো, ৭ অক্টোবর জাতীয় পর্যায়ে পরাজয় ও বিভ্রান্তির যে বয়ান তৈরি হয়েছিল, তাকে উল্টে দেওয়া। গত বছরের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলা ছিল ইসরাইলি গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর জন্য এক বড় অপমান। ইসরাইল সব সময় শত্রুদের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে থাকে- এ সুনাম এক দিনেই ধসে পড়েছিল। এর পর শুরু হওয়া গাজা যুদ্ধে ইসরাইলের গর্ব বা নিরাপত্তা কোনোটিই পুনরুদ্ধার হয়নি। যে অভিযানে বিপুল পরিমাণ বেসামরিক মানুষ নিহত হয়েছে, সেই অভিযানের মাধ্যমে ইসরাইল সব জিম্মিকে এখনো মুক্ত করতে পারেনি। বৈশ্বিক জনমতের লড়াইয়েও ইসরাইল ক্রমে হেরে যাচ্ছে। দেশটি আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) গণহত্যার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে আগ্রাসী ইসরাইল ও তার মিত্র যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে যে যুদ্ধ চাপিয়ে দিচ্ছে হাসান নাসরুল্লাহ তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শক্তি গড়ে না তুললে মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্র এতদিন পাল্টে যেত। জীবিত নাসরুল্লাহর চেয়ে শহিদ নাসরুল্লাহ যে আরো বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছেন শত্রুরা আজ তা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করছে। সাইয়্যেদ নাসরুল্লাহ আজ আমাদের মাঝে সশরীরে না থাকলেও তিনি বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকবেন অনন্তকাল ধরে।

# ফিলিস্তিনের আরেক উজ্জ্বল নক্ষত্র শহিদ ইয়াহিয়া সিনওয়ার

**খন্দকার মোঃ মাহফুজুল হক**

ফিলিস্তিনের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল মুহূর্তের অন্যতম প্রধান কুশীলব হিসেবে প্রথমেই উঠে আসে শহিদ ইয়াহিয়া সিনওয়ারের নাম। অধিকৃত ফিলিস্তিনের অব্যাহত সংগ্রামে তাঁর বিচক্ষণ নেতৃত্ব, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, প্রজ্ঞা, মেধা, সাহস ও চারিত্রিক দৃঢ়তা ফিলিস্তিনিদের জন্য অনুপ্রেরণার জায়গায় পরিণত হয়েছিল। তিনি অর্জন করেছিলেন নির্যাতিত ও মুক্তিকামী ফিলিস্তিনিদের অগাধ আস্থা এবং হয়ে উঠেন অগ্নিপুরুষ। তাঁর বিপ্লবী জীবন ছিল গল্পের মতো রোমাঞ্চকর। এক পর্যায়ে সিনওয়ার নামটি হয়ে ওঠে আগ্রাসী ইসরাইলের শাসকগোষ্ঠী ও বর্ণবাদী ইহুদিদের জন্য আতঙ্কের। তরুণ বয়স থেকেই তিনি সম্পৃক্ত হয়েছিলেন ইসলামি আন্দোলনের সঙ্গে। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নেতৃত্ব দেন দখলদার ইহুদিবাদী রেজিমবিরোধী বিভিন্ন অভিযানে। একটি উদ্বাস্তু পরিবারে বেড়ে ওঠার কারণে খুব শৈশব থেকেই তিনি লালন করেন মুক্তি ও স্বাধিকার অর্জনের জন্য জীবন বাজি রেখে সংগ্রামের অদম্য স্পৃহা। বাস্তুহারা স্বজাতি ফিলিস্তিনিদের প্রতি তাঁর ছিল গভীর মমত্ববোধ। ফিলিস্তিনি জাতির আদর্শরূপে যে সকল ব্যক্তি নিজেদের ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে অমর, স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন, তাঁদের অন্যতম মহাপুরুষ শহিদ সিনওয়ার। তাঁর জনপ্রিয়তার গণ্ডি ফিলিস্তিন ভূখণ্ড পেরিয়ে ছড়িয়ে গেছে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও।

এই সংগ্রামী নেতাকে আরো ভালো করে জানতে হলে তাকাতে হবে তাঁর জীবনের প্রতিটি পরতে পরতে এবং মৃত্যুর দৃশ্যপটেও।

**কে এই সিনওয়ার?**

ইয়াহিয়া ইবরাহিম হাসান আল-সিনওয়ার, যিনি ইয়াহিয়া সিনওয়ার নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন, ১৯৬২ সালের ৭ নভেম্বর গাজার খান ইউনুস শরণার্থী শিবিরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পরিবারের আদি বাসস্থান ছিল মাজদাল আসকালানে। ১৯৪৮ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পর সিনওয়ারের পরিবারকে বাধ্য হয়ে মাজদাল আসকালান ছেড়ে গাজার খান ইউনুসে চলে যেতে হয় এবং সেখানেই তাঁরা শরণার্থী হিসেবে নতুন জীবন শুরু করেন। শিবিরটি ছিল দরিদ্র পরিবারে পরিপূর্ণ, তারা অসহায় অবস্থায় বাস করত এবং মৌলিক পরিষেবার জন্য জাতিসংঘের ত্রাণ ও কর্ম সংস্থার (UNRWA) উপর নির্ভরশীল ছিল। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন হয় শরণার্থী শিবিরেই। এরপর ১৯৮০ এর দশকের গোড়ার দিকে তিনি গাজার ইসলামিক ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হন এবং আরবি ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। টগবগে এই তরুণ যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন, সেই সময়টিতে ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংঘাত অবসানে প্যান অ্যারাবিজম এর ব্যর্থতার কারণে ফিলিস্তিনের তরুণ-যুবকরা ক্রমবর্ধমানভাবে ইসলামি আন্দোলনের দিকে ঝুঁকছিল। ফলে ফিলিস্তিনি জাতীয়তাবাদের সাথে ইসলামি চিন্তাধারার সমন্বয়কারী ছাত্র সংগঠনগুলো দ্রুত শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে। শহিদ সিনওয়ার এই ধরনের সংগঠনে যুক্ত হয়ে অন্যতম প্রধান ছাত্র সমন্বয়ক হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেন। পরিণতিতে, ১৯৮২ সালে কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ না থাকা সত্ত্বেও ২০ বছর বয়সী তরুণ সিনওয়ারকে গ্রেপ্তার করা হয়।

অবশ্য ৪ মাস আটক রাখার পর তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু

মুক্তি পাওয়ার মাত্র এক সপ্তাহ পরে তাঁকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয় এবং বিনা বিচারে ছয় মাস কারাগারে আটক রাখা হয়।

হামাস গঠিত হওয়ার আগে, ১৯৮৫ সালে শহিদ সিনওয়ার 'মানাহিমাতুল জিহাদ ওয়াদ দাওয়াহ' সংক্ষেপে 'মাজদ' নামক একটি দল গঠনে অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করেন। এই সংগঠনটি মূলত ফিলিস্তিনি মুক্তিকামী সংগঠনগুলো, এমনকি পরবর্তীকালে হামাসের ভিতরে ঘাপটি মেরে থাকা ইসরাইলি এজেন্টদের বিষয়ে তদন্ত পরিচালনা এবং ইসরাইলি গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের ট্র্যাক করার মতো দুঃসাহসিক কাজের দায়িত্ব পালন করত।

১৯৮৭ সালে শহিদ শেখ আহমেদ ইয়াসিন কর্তৃক হামাস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরপরই যাঁরা সংগঠনটির নেতৃত্বে আসেন, শহিদ ইয়াহিয়া সিনওয়ার ছিলেন তাঁদের একজন। তাঁর নেতৃত্বে হামাসের যোদ্ধারা ইসরাইলের বিরুদ্ধে বেশ কিছু সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছে, যার মধ্যে ২০১৪ সালের গাজা যুদ্ধ অন্যতম। এই যুদ্ধের সময় তাঁর সামরিক কৌশল এবং পরিকল্পনা আন্তর্জাতিক মনোযোগ আকর্ষণ করে। হামাসে যোগ দেওয়ার পরের বছর ১৯৮৮ সালে তাঁকে আরেক দফা গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয় এবং এর পরের বছর ১৯৮৯ সালে ২ ইসরাইলি সেনা ও চার ফিলিস্তিনি গুপ্তচরকে হত্যায় নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগে তাঁর বিচার করা হয়। এ মামলায় তাঁর চার দফা যাবজ্জীবন অর্থাৎ ৪২৬ বছর কারাদণ্ড হয়। এরপর থেকে টানা প্রায় ২৩ বছর তিনি ইসরাইলি কারাগারে আটক ছিলেন।

**শহিদ সিনওয়ারের কারাজীবন**

এই সংগ্রামী ও মুক্তিকামী নেতার ৬২ বছরের জীবনের ২৩ বছরই কেটেছে বর্ণবাদী ইসরাইলের কারাগারে বন্দি অবস্থায়। এর অনেকটা সময় তাঁকে বরণ করতে হয়েছে নির্জন কারাবাস। তাঁর অপরাধ ছিল একটিই। তিনি দখলদার ইহুদিবাদীদের কবল থেকে প্রিয় মাতৃভূমি ফিলিস্তিনকে মুক্ত করার দুর্বার সংগ্রামে নেতৃত্বের সামনের সারিতে ছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখতেন দখলমুক্ত স্বাধীন ফিলিস্তিনের। ফিলিস্তিনিদেরকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে দেশের হারানো স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ফিরিয়ে আনাই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। মুসলমানদের প্রথম কেবলা মসজিদে আকসা এবং নবী-রাসূলদের স্মৃতিধন্য বরকতময় ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের উপর বহিরাগত বর্ণবাদী ইহুদিদের দখলদারিত্ব মেনে নিতে পারেননি তিনি। পুণ্যভূমি ফিলিস্তিনকে মুক্ত করার বাসনা তাঁর মনকে ব্যাকুল করে তোলে। এই ব্যাকুলতাই তাঁকে পরিণত করে এক সংগ্রামী মহানায়কে। উপরন্তু ফিলিস্তিনি জনগণের উপর যায়নবাদী ইহুদিদের হত্যাযজ্ঞ, সীমাহীন অত্যাচার-নির্যাতনের বিভীষিকাময় চিত্র তাঁকে ভীষণভাবে আন্দোলিত করেছিল। এই প্রেক্ষাপটে তিনি জীবনের মায়া ত্যাগ করে দখলদার বর্ণবাদী ইহুদিদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকেই জীবনের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে সাব্যস্ত করেন। এই লক্ষ্য অর্জনে তিনি সব সময় শাহাদাত বরণ করতে প্রস্তুত ছিলেন।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত নির্ভীক, সাহসী ও ঈমানি শক্তিতে বলীয়ান। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও নিজ অবস্থানে অনড় থাকার এক বিরল গুণ ছিল তাঁর মধ্যে। ৪২৬ বছরের কারাদণ্ডাদেশ মাথায় নিয়েও তিনি ছিলেন পাহাড়ের মতো অবিচল। কারাবাসকে তিনি শিক্ষা, অধ্যয়ন ও ইসলামি আদর্শ প্রচারের বড় সুযোগ হিসেবে কাজে লাগিয়েছেন। কারাগারে বন্দি অবস্থায় তিনি হিব্রু ভাষা আয়ত্ত করেন এবং নিয়মিত হিব্রু ভাষায় ইসরাইলের পত্রিকা পড়তেন।

শহিদ সিনওয়ারকে জিজ্ঞাসাবাদকারী ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা শিনবেতের কর্মকর্তা মিকা কুবিকে উদ্ধৃত করে ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কারাবন্দি ইয়াহিয়া সিনওয়ার তাঁর দৃঢ় সঙ্কল্প ও অধ্যবসায়ের জোরে হিব্রু ভাষা এতটাই রপ্ত করতে পেরেছিলেন যে, তিনি ভ্লাদিমির জাবোটিনস্কি, মেনাচেম বেগিন এবং আইজাক রবিনের মতো প্রভাবশালী ইহুদিবাদী রাজনীতিকদের জীবনীগ্রন্থ পড়তেন এবং তাদের রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা জানার চেষ্টা করতেন।

একজন প্রকৃত নেতার মধ্যে বহুমুখী গুণাবলি থাকতে হয়। ছেলেবেলা থেকেই শহিদ সিনওয়ার স্বল্পভাষী হলেও ছিলেন প্রাণবন্ত। আগ্রাসনের শিকার একটি ভূখণ্ডে শরণার্থী শিবিরে বেড়ে ওঠায় একটি আদর্শিক চিন্তা ও দর্শনের উপর টিকে থাকার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে তাঁর জীবনের শুরু। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সেই জীবন দর্শন থেকে এক মুহূর্তের জন্যও বিচ্যুত হননি শহিদ সিনওয়ার। ইরানের ইসলামি বিপ্লব এবং মুসলিম ব্রাদারহুডের আদর্শ তাঁর চিন্তা ও চেতনাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল। অধ্যয়ন, লেখালেখি ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর ছিল বিশেষ অনুরাগ। সেই স্বাক্ষরও রেখে গেছেন তিনি। বন্দি জীবনে তিনি ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা শিনবেতের সাবেক দুই প্রধানের তিনটি বই হিব্রু থেকে আরবিতে অনুবাদ করেন। এ ছাড়া লেখেন আরও দুটি গবেষণা বই, একটি আখ্যান ও একটি উপন্যাস। উপন্যাসের নাম 'আশ-শাওকু ওয়াল কারানফুল'। বাংলা অনুবাদে উপন্যাসটির নাম 'কাঁটা ও ফুল'। উপন্যাসটি তিনি ২০০৪ সালে ইসরাইলের 'বিইর শিবা' কারাগারে বন্দি থাকা অবস্থায় লিখেছিলেন। ইসরাইলের কারাগারে বসে বই তো দূরের কথা, কোনো চিরকুট লেখাও প্রায় অসম্ভব ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। শহিদ সিনওয়ার তাঁর নিবেদিতপ্রাণ কারাসঙ্গীদের সহায়তায় সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করেছিলেন। কারাগারে তাঁর সঙ্গীরা প্রহরীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে তাঁর লেখাগুলো গোপনে কপি করে তা নানা উপায়ে সবার কাছে পৌঁছে দিতেন। এভাবে তাঁরা অত্যন্ত পরিশ্রম ও ঝুঁকি নিয়ে বইটিকে আলোর মুখে আনেন। 'আশ-শাওকু ওয়াল কারানফুল' উপন্যাসে শহিদ সিনওয়ার ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধ থেকে শুরু করে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ফিলিস্তিনের, বিশেষত গাজার দুর্দশাপীড়িত জনজীবন, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও রাজনৈতিক অন্তর্দ্বন্দ্বকে তুলে ধরেছেন। এতে উঠে এসেছে ফিলিস্তিনি সংগ্রামী তরুণ-যুবকদের প্রেম, সংগ্রাম, আশা-হতাশা, কোমলতা এবং আত্মশক্তির নানা দিক। 'কাঁটা ও ফুল' উপন্যাসটির এমন নামকরণের মধ্যেই ফুটে উঠেছে গাজার জীবনের প্রতিচ্ছবি। গাজার মানুষের দুঃখ-যাতনা ও কষ্টের জীবন– যা কাঁটার প্রতীক, তবে লেখক এটিকে আনন্দের প্রতীক লবঙ্গ ফুলের সাথে তুলনা করেছেন।

### কারাগার থেকে মুক্তি ও নতুন অধ্যায়ের সূচনা

২০১১ সালে বন্দিবিনিময় চুক্তির আওতায় এক হাজার ফিলিস্তিনির সঙ্গে কারামুক্ত হন সিনওয়ার। গিলাদ শালিত নামের ইসরাইলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর এক সদস্যের মুক্তির বিনিময়ে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। শালিত, ২০০৬ সালে একটি সীমান্ত ক্রসিংয়ে অবস্থানকালে হামাসের যোদ্ধাদের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিল। ইসরাইলের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ইয়াহিয়া সিনওয়ার যখন গাজায় প্রবেশ করেন তখন তাঁর কপাল জুড়ে শোভা পাচ্ছিল হামাসের সবুজ হেডব্যান্ড। মুক্তির পর ২০১২ সালে শহিদ সিনওয়ার হামাসের পলিট ব্যুরোর সদস্য নির্বাচিত হন এবং নিরাপত্তা বিষয়ক দায়িত্ব পান। ২০১৩ সালে তিনি হামাসের সামরিক শাখা ইজ্জুদ্দীন কাসসাম ব্রিগেডের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি একজন ক্যারিশম্যাটিক নেতা ও সামরিক কমান্ডার ছিলেন। বাগ্মিতায় ছিলেন অসাধারণ। তাঁর অগ্নিঝরা বক্তব্য দখলদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ফিলিস্তিনি তরুণ-যুবকদের জন্য ছিল অনুপ্রেরণার উৎস। সাহসিকতা, প্রতিশ্রুতিশীল ও শক্তিশালী নেতৃত্ব তাঁকে সামনের কাতারে নিয়ে আসে। ফলস্বরূপ, ২০১৭ সালে গাজায় হামাস আন্দোলনের রাজনৈতিক ব্যুরোর প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হন এবং ২০২১ সালে তিনি হামাসের অভ্যন্তরীণ নির্বাচনে চার বছর মেয়াদের জন্য পুনঃনির্বাচিত হন। এরপর থেকে শহিদ ইয়াহিয়া সিনওয়ারের সংগ্রামী জীবনে সূচনা হয় নতুন অধ্যায়।

ইসরাইলি কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই শহিদ সিনওয়ার ফিলিস্তিনের মুক্তির জন্য একটি বড় অপারেশনের কথা ভাবতে শুরু করেন। ২০২২ সালের এপ্রিলে একটি টেলিভিশন ভাষণে তিনি জনগণকে সকল উপায়ে দখলদার ইসরাইলিদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। বহিরাগত ইহুদিবাদীদের হাত থেকে নিজ মাতৃভূমি এবং মুসলমানদের প্রথম কেবলা আল আকসা মসজিদ মুক্ত না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতির উপর তিনি ছিলেন অটল। দৃঢ়চেতা, সাহসিকতাপূর্ণ ও আপোষহীন মনোভাবের কারণে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল তাঁকে জমের মতো ভয় করত। আমাদের সকলেরই জানা যে, গুপ্তহত্যা বা টার্গেটে কিলিংয়ে ইসরাইলের কুখ্যাতি রয়েছে বিশ্বজুড়ে। হামাসের গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের অধিকাংশই নিহত হয়েছেন ইসরাইলি গোয়েন্দা সেনাদের গুপ্তহত্যার শিকার হয়ে। ১৯৯৬ সালের ৫ জানুয়ারি গাজার বেইত লাহিয়ায় দখলদার ইসরাইলের গুপ্ত হামলায় নিহত হন হামাসের প্রভাবশালী নেতা ইয়াহিয়া আইয়াশ। ২০০৪ সালের মার্চ মাসে হামাসের আধ্যাত্মিক নেতা ও প্রতিষ্ঠাতা শেখ আহমাদ ইয়াসিন যখন ফজরের নামাজ পড়ে মসজিদ থেকে বের হন, ঠিক তখন দখলদারদের একটি ক্ষেপণাস্ত্র তাঁর উপর আছড়ে পড়ে। ঘটনাস্থলেই দেহরক্ষীসহ প্রাণ হারান শেখ আহমাদ ইয়াসিন। একই বছরের ২৪ মার্চ হামাসের সাবেক আধ্যাত্মিক নেতা শেখ আহমাদ ইয়াসিনের পারিবারিক বাড়ি পরিদর্শনের সময় গুপ্ত হামলায় গুরুতর আহত হন আবদেল আজিজ। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৭ এপ্রিল মৃত্যুবরণ করেন তিনি। শহিদ আবদেল আজিজ 'ফিলিস্তিনির সিংহ' নামে পরিচিত ছিলেন। এই ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের ২ জানুয়ারি হামাসের উপ-প্রধান সালেহ আল-আরোরি শহিদ হন। ৫৭ বছর বয়সি সালেহ হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর উপ-প্রধান এবং দলটির সশস্ত্র শাখা ইজ্জুদ্দীন কাসসাম ব্রিগেডের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। একই বছরের ৩১ জুলাই গুপ্ত হামলার মাধ্যমে শহিদ করা হয় হামাসের রাজনৈতিক শাখার প্রধান ইসমাইল হানিয়াহকে। বর্ণবাদী ইসরাইলের গুপ্ত হামলার তালিকা থেকে বাদ যায়নি ইয়াহিয়া সিনওয়ারের নাম। অন্তত ছয়বার তাঁকে হত্যার ব্যর্থ চেষ্টা হয়েছিল।

## শাহাদাত

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাস বা প্রতিরোধ অক্ষের জন্য একটি অবিস্মরণীয় দিন। এই দিনে হামাস যোদ্ধারা ইসরাইলি ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে কমান্ডো স্টাইলে এক দুঃসাহসিক অভিযান চালায় এবং ইসরাইলের অপরাজেয়তার মিথকে ভেঙ্গে দেয়। ওই অভিযানের পর হামাসের পক্ষ থেকে বলা হয়, যায়নবাদী ইহুদিদের মাধ্যমে পবিত্র মসজিদ আল আকাসার অবমাননা এবং ফিলিস্তিনিদের উপর বহু বছর ধরে চালিয়ে আসা দখলদার ইসরাইলি বাহিনীর আগ্রাসনের জবাবে ওই অভিযান পরিচালিত হয়েছে। এই অভিযানে হামাস কমান্ডোদের হাতে ১২ শত ইহুদিবাদী নিহত এবং ২৪২ জন বন্দি হয়। মনে করা হয় শহিদ সিনওয়ার ওই কমান্ডো অভিযানের মাস্টার মাইন্ড বা মূল পরিকল্পনাকারী। ৭ অক্টোবর 'আল আকসা ঝড়' নামে ওই অভিযানের পর শুরু হয় গাজায় ইসরাইলি বাহিনীর গণহত্যার অভিযান। গত এক বছর ধরে ইহুদিবাদীরা আন্তর্জাতিক সমাজের চোখের সামনে হত্যা করেছে ৪২ হাজারের বেশি নিরীহ ফিলিস্তিনিকে, যাদের অধিকাংশই নারী ও শিশু। আর ইহুদিবাদীদের এই নারকীয় তাণ্ডবে আহতের সংখ্যা লক্ষাধিক। প্রতিশোধের নেশায় উন্মত্ত ইসরাইলি সেনারা গত একটি বছর ধরে হন্যে হয়ে খুঁজছিল শহিদ ইয়াহিয়া সিনওয়ারকে। অবশেষে ১৬ অক্টোবর ২০২৪ এই বীর লড়াকু সৈনিক মুখোমুখি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলেন হানাদার সেনাদের সাথে। এক দিকে কয়েকজন মুক্তিকামী যোদ্ধা অপর দিকে অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত দখলদার বর্ণবাদী ইহুদিদের বিশাল সেনাবহর। শত্রু সেনাদের ভারী অস্ত্র ও রকেট লাঞ্চারের আঘাতে মারাত্মক আহত হলেন সিনওয়ার। আহত অবস্থাতেও এই ফিলিস্তিনি সিংহকে সামনাসামনি হত্যা করার দুঃসাহস দেখাতে পারেনি দখলদার সেনারা। কাপুরুষের দল দূর থেকে ট্যাংক দ্বারা শেলিং করে শহিদ করে এই যুগশ্রেষ্ঠ মহাবীরকে। তিনি সফল হয়ে গেলেন, পৌঁছে গেলেন সারা জীবনের লালিত স্বপ্ন শাহাদাতের উচ্চ মাকামে। তিনি চলে গেছেন জাগতিক পর্দার আড়ালে, কিন্তু তাঁর সংগ্রামী জীবন ও আদর্শ বাতিঘর হিসেবে যুগের পর যুগ বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষ, বিশেষ করে ফিলিস্তিনের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অনুপ্রেরণা দিয়ে যাবে।

**২০২২ সালের এপ্রিলে একটি টেলিভিশন ভাষণে তিনি জনগণকে সকল উপায়ে দখলদার ইসরাইলিদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। বহিরাগত ইহুদিবাদীদের হাত থেকে নিজ মাতৃভূমি এবং মুসলমানদের প্রথম কেবলা আল আকসা মসজিদ মুক্ত না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতির উপর তিনি ছিলেন অটল।**

## উপসংহার

শহিদ ইয়াহিয়া সিনওয়ারের শাহাদাতের পর ফিলিস্তিনের মুক্তি সংগ্রামের ভবিষ্যৎ কী হবে এটা এখন অনেকেরই প্রশ্ন। আসলে হামাস কিংবা ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ আন্দোলনগুলো দমে যাওয়ার মতো নয়। কারণ, হামাসসহ প্রতিরোধ অক্ষ টিকে আছে তাদের আদর্শের জোরে। তাদের শীর্ষ নেতা শেখ আহমাদ ইয়াসিন, ড. আবদেল আজিজ আল-রানতিসি, সালাহ শাহাদা, ইয়াহিয়া আয়াশ, সালাহ আল আরোরি, ইসমাইল হানিয়াহ প্রত্যেককে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু তারপরও হামাসকে স্তব্ধ করা যায়নি। বরং তারা আরও জনপ্রিয় হয়েছে। আরও শক্তিশালী হয়েছে। কারণ, হামাস কখনই ব্যক্তিকেন্দ্রিক দল নয়। এটি আদর্শকেন্দ্রিক এবং আরব বিশ্বের জনপ্রিয় একটি দল। যারা জনগণের স্বার্থে, জনগণের জন্য রাজনীতি করে। জনগণের চাওয়া-পাওয়ার সাথে মিল রেখে একই সাথে আদর্শকে বিসর্জন না দিয়ে এগিয়ে চলে। শাহাদাত যেই দলের আদর্শ, কোনো ব্যক্তি বা নেতার অনুপস্থিতিতে সেই দল ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। বরং শহিদের রক্ত থেকে জন্ম নেয় নতুন নেতৃত্ব। পবিত্র কুরআনের সূরা আহযাবে বলা হয়েছে : মুমিনদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে কৃত তাদের প্রতিশ্রুতি সত্যে বাস্তবায়ন করেছে। তাদের কেউ কেউ (যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করে) তাদের দায়িত্ব পূর্ণ করেছে, আবার কেউ কেউ (শাহাদাত বরণের) প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা (প্রতিশ্রুতিতে) কোনো পরিবর্তনই করেনি।

সিনওয়ারের শাহাদাতের পর ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেয়ী বলেছেন, ফিলিস্তিনের স্বাধিকার আন্দোলনের ইসলামি সংগঠন হামাস আছে এবং থাকবে ইনশাআল্লাহ। একই সঙ্গে ইসরাইলবিরোধী বাহিনীর প্রতি ইরানের সমর্থন অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি অঙ্গীকার করেছেন।

শহিদ সিনওয়ারের মৃত্যুতে হামাস হয়ত সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, তারা নিশ্চিহ্ন হবে না, নির্মূল হবে না, থেমে যাবে না। যতদিন ফিলিস্তিনে ইসরাইলের অবৈধ দখলদারিত্ব থাকবে ততদিন প্রতিরোধও থাকবে। প্রতিটি শহিদের রক্ত থেকে জন্ম নেবে হাজারো সংগ্রামী সৈনিক। এ প্রসঙ্গে কবি আল মাহমুদ যথার্থই বলেছেন তাঁর 'আমাদের মিছিল' কবিতায়। তিনি লিখেছেন :

'আমরা তো শাহাদাতের জন্যই মায়ের উদর থেকে পৃথিবীতে পা রেখেছি।
কেউ পাথরে, কেউ তাঁবুর ছায়ায়,
কেউ মরুভূমির উষ্ণ বালু কিংবা সবুজ কোনো ঘাসের দেশে।
আমরা আজন্ম মিছিলেই আছি,
এর আদি বা অন্ত নেই।'

লেখক : আইআরআইবি বাংলা বিভাগের সাবেক পরিচালক

# গাজা ও লেবাননে ইহুদিবাদী ইসরাইলি অপরাধযজ্ঞ এবং মুসলিম বিশ্বের দায়িত্ব-কর্তব্য

**অধ্যক্ষ মুহাম্মদ শওকাত হোসেন**

ইসলামের অন্যতম পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিন। যেখানে রয়েছে মুসলমানদের প্রথম কেবলা বায়তুল মুকাদ্দাস আল-কুদস আশ-শরীফসহ অসংখ্য নবীর কবর ও স্মৃতিময় নিদর্শন। সাত দশকের বেশি সময় ধরে ইহুদিবাদ তথা জায়নবাদের আগুনে পুড়ছে এই পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিন। ইসলাম ও মুসলমানদের চিরশত্রু ব্রিটিশ ও আমেরিকা তথা ন্যাটো ও যুক্তরাষ্ট্রের মদদে ফিলিস্তিনকে মুসলিমশূন্য করার লক্ষ্যে চলছে বিশ্ব-ইতিহাসের নির্মম ও দীর্ঘতম হত্যাযজ্ঞ। ওদের নির্বিচারে নারী-শিশু-বৃদ্ধকে নিঃশেষ করার প্রতিদিনের নির্মমতা বিশ্বের প্রতিটি মানব হৃদয়কে করছে ক্ষতবিক্ষত। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে শুরু করা প্রতিদিনের হত্যাযজ্ঞে ফিলিস্তিনের গাজা ও লেবাননে প্রায় অর্ধলক্ষ সাধারণ মুসলমান প্রাণ হারিয়েছে। বিশ্বের শান্তিকামী মানবতাবাদী মানুষ ও রাষ্ট্রগুলোর নিন্দা-প্রতিবাদকে ওই নৃশংস হত্যাকারী জায়নবাদীরা গ্রাহ্য করছে না। আর তাদেরকে অস্ত্র দিয়ে, শক্তি দিয়ে, প্রযুক্তি দিয়ে মদদ যোগাচ্ছে মানবতার শত্রু ন্যাটো ও যুক্তরাষ্ট্র।

ফিলিস্তিনের একটি প্রাচীন জনপদের নাম গাজা উপত্যকা। ৩২০ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে গঠিত এই এলাকায় রয়েছে চারটি শহর, আটটি ফিলিস্তিনি শরণার্থী শিবির এবং এগারোটিগ্রাম। ১২ লক্ষ ফিলিস্তিনি মুসলমান ছাড়াও এখানে নতুনভাবে বসতি স্থাপনকারী ১৭ হাজার দখলদার ইসরাইলি বাস করছে। গাজার পশ্চিমে রয়েছে ভূমধ্যসাগর, দক্ষিণ-পশ্চিমে রয়েছে মিশর, পূর্ব ও দক্ষিণে রয়েছে ইসরাইল। স্বশাসিত এই এলাকায় ২০০৭ সাল থেকে হামাস রয়েছে এখানকার শাসন কর্তৃপক্ষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

বছরাধিক কাল ধরে জায়নবাদী ইসরাইলের নৃশংস হামলায় গাজা ও লেবাননে প্রতিদিন শত শত মুসলমান তথা সাধারণ মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে। জাতিসংঘসহ সারা বিশ্বের তীব্র নিন্দা-প্রতিবাদে সামান্যতম ভ্রুক্ষেপ নেই ইসরাইলি কসাই প্রধানমন্ত্রী মানবতার শত্রু নেতানিয়াহুর।

প্রায় দেড় শত বছর আগে প্রতিষ্ঠিত উগ্র ইহুদিরা জায়নবাদী আন্তর্জাতিক সংস্থা তৈরি করে তাদের একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নীল নকশা প্রণয়ন করে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেলফোর মধ্যপ্রাচ্য তথা ফিলিস্তিন এলাকায় একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। এই ঘোষণাকে 'ঐতিহাসিক বেলফোর ঘোষণা' বলা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তুর্কিদের হাত থেকে ১৯১৭ সালে ব্রিটিশরা ফিলিস্তিন এলাকার কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। তারা ১৯৮৪ পর্যন্ত একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট রচনা করে। ফিলিস্তিনে তখন ইহুদিদের সংখ্যা ছিল শতকরা ১০ জনেরও কম। কিন্তু ব্রিটিশ ও আন্তর্জাতিক ইহুদিবাদীদের সহযোগিতায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে এসে এই সময় হাজার হাজার ইহুদি ফিলিস্তিন এলাকায় বসতি স্থাপন করে।

এভাবে একটি অবৈধ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপট তৈরি করে মানবতার শত্রু সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার। ১৯৪৮ সালে ব্রিটিশরা যেদিন ফিলিস্তিন ছেড়ে চলে যায় সেদিন তারা ফিলিস্তিনকে দুই ভাগ করে 'ইসরাইল' ও 'ফিলিস্তিন' নামের দুটি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি প্রদান করে যায়। অর্ধেক রাষ্ট্র ইহুদিদেরকে দিলেও তারা প্রায় ৯০% ফিলিস্তিনি ভূমি দখল করে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলের সূচনা করে। তখন থেকে শুরু হয় ইহুদিবাদী কসাইদের হত্যাযজ্ঞ আর ওই এলাকার মুসলমানদের মৃত্যু অথবা উদ্বাস্তু হওয়ার ইতিহাস। ১৯৮৪ সাল, ১৯৬৭ সাল সহ বেশ কয়েকটি আরব-ইসরাইল যুদ্ধ হলেও তাতে ইসরাইল আরও শক্তিশালী হয়েছে। পরবর্তীকালে ফিলিস্তিনিদের বিভিন্ন সংগঠনের সমন্বয়ে ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বে পিএলও মুক্তি আন্দোলন চালালেও তারা ইসরাইলের বিরুদ্ধে কোনো সশস্ত্র শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়নি। বরং ১৯৭৮ সালে আমেরিকার মধ্যস্থতায় 'ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি'র মাধ্যমে মিশর, পিএলও সবাই ইসরাইলের অস্তিত্বকে মেনে নেয়।

ইসরাইল তাদের হত্যা-নিপীড়নের কার্যক্রম কম-বেশি সব সময় চালিয়ে আসছে। ১৯৭৯ সালে ইরানের ইসলামি বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন ঘটে। ফিলিস্তিনে সৃষ্টি হয় ইসলামি আদর্শভিত্তিক মুক্তিকামী সংগ্রামী কাফেলা হামাস। লেবাননে প্রতিষ্ঠিত হয় আরেকটি ইসলামি মুক্তি কাফেলা হিযবুল্লাহ। শুরু হয় ইসরাইলের বিরুদ্ধে নতুন সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাস। ৮৭ সালে ফিলিস্তিনি শিশুরা ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে 'ইন্তিফাদা'র সূচনা করে যা পরবর্তীকালে সশস্ত্র সংগ্রামে রূপ নেয়। কিন্তু ইসরাইলিদের সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের নীল নকশা অনুযায়ী তারা ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদ করা, হত্যা করা এবং ইহুদিদের নতুন নতুন বসতি স্থাপন অব্যাহত রাখে। আর মাঝে মাঝেই ছোটখাটো ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইসরাইলি বাহিনী নির্বিচারে হত্যা করত নারী-শিশু ও সাধারণ মানুষদের।

এ ধরনের প্রতিনিয়ত নিপীড়ন-নির্যাতনের প্রেক্ষাপটে ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাস-এর একটি সামরিক শাখা ইসরাইলি সামরিক স্থাপনা লক্ষ্য করে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করে। এখান থেকেই শুরু হয় ইসরাইলি কসাই বাহিনীর নৃশংস হত্যাকাণ্ড। তাদের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে লেবাননের হিযবুল্লাহ এবং ইয়েমেনের হুতি বাহিনী ইসরাইলের বিভিন্ন সামরিক স্থাপনার উপরে আক্রমণ চালায়। ন্যাটো ও আমেরিকার সহযোগিতায় ইসরাইলি হানাদার বাহিনী এরপর থেকে প্রতিদিন গাজা ও লেবাননের উপর নিয়মিত বোমা বর্ষণ সহ নির্বিচারে গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে। গত বছরাধিক কাল ধরে তারা প্রায় অর্ধ লক্ষ ফিলিস্তিনি ও লেবাননের জনগণকে হত্যা করেছে। এরা বিভিন্ন স্কুল, আশ্রয়কেন্দ্র হাসপাতালকে টার্গেট করে সাধারণ মানুষকে নির্বিচারে গণহত্যা করে যাচ্ছে। অন্যদিকে মজলুম ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে হিযবুল্লাহ ও হুতিরা তাদের হামলা অব্যাহত রেখেছে। জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এই যুদ্ধ বন্ধের জন্য একাধিক প্রস্তাব গ্রহণ করেছে, ইসরাইলের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে, কিন্তু তারপরেও তারা তাদের বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড থামায়নি। এমন কোনো দিন নেই যেদিন অন্তত শতাধিক ফিলিস্তিনি তারা হত্যা না করে।

ইসরাইলের অনুসারীরা এ যুদ্ধের জন্য হামাসের ৭ অক্টোবরের আক্রমণকে দায়ী করে। এটা ঠিক নয়। কারণ, প্রতিনিয়ত ইসরাইলি নির্যাতন-নিপীড়নে ফিলিস্তিনিদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গিয়েছিল। এই সময়ে প্রতি আক্রমণ ছাড়া তাদের সামনে কোনো বিকল্প ছিল না। অন্যদিকে সৌদি আরবসহ আরব বিশ্বের বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিয়ে সম্পর্ক সৃষ্টিতে উদ্যোগ নিয়েছিল। এই আক্রমণের ফলেই সে উদ্যোগ ভেস্তে যায়। 'ইসরাইলকে আক্রমণ করা সম্ভব না' অথবা 'ইসরাইল যেকোনো প্রতি আক্রমণের উর্ধ্বে'– এই ধারণাকে দূর করে দিয়েছে হামাস ও হিযবুল্লাহ। হামাস, হিযবুল্লাহ ও হুতিদের সঙ্গে রয়েছে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সার্বিক অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা। ইতোমধ্যেই ইরান সরাসরি আক্রমণ করে ইসরাইলের সামরিক স্থাপনাসমূহ ধ্বংস করে ইরানের শক্তি ও সামর্থ্যের প্রমাণ দিয়েছে।

একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, হামাস-হিযবুল্লাহ তাদের টার্গেট হিসেবে গ্রহণ করেছে ইসরাইলি সামরিক স্থাপনাসমূহ, কিন্তু ইসরাইলের টার্গেট হচ্ছে ফিলিস্তিনের সাধারণ নিরপরাধ জনগণ। তাদের আক্রমণ থেকে হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, এমনকি আশ্রয় শিবির কিংবা আন্তর্জাতিক সাহায্যকারী সংস্থাসমূহও রেহাই পাচ্ছে না। পাশাপাশি তারা গুপ্তহত্যার মাধ্যমে হামাস-প্রধান ইসমাইল হানিয়া

ও হিযবুল্লাহ-প্রধান সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহসহ বিখ্যাত সব নেতা ও জেনারেলকে হত্যা করার নিকৃষ্ট নজির স্থাপন করেছে। তবে এই যুদ্ধে ইসরাইলের অবস্থাও যে খুবই জড়োসড়ো পর্যায়ে পৌঁছেছে, সেটা এখন বিশ্ববাসীর কাছে পরিষ্কার। সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন ইসরাইলের অস্তিত্ব পৃথিবী থেকে বিলীন হবে, ফিলিস্তিন স্বাধীন হবে, আল-আকসা মুক্তি পাবে।

১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পরে বিশ্বের মুসলমানদেরকে ফিলিস্তিনের মুক্তি সংগ্রামীদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে ওআইসি বা ইসলামি সম্মেলন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এবারের ইসরাইলি নিধনযজ্ঞের বিরুদ্ধে ওআইসি যথাযথ ভূমিকা রাখতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। তাদের কোনো উল্লেখযোগ্য তৎপরতা আমরা দেখিনি। এটা খুবই দুঃখজনক, বেদনাদায়ক এবং মুসলিম উম্মাহর জন্য কষ্টের বিষয়। ইরানের মহান ইসলামি বিপ্লবের পরে বিপ্লবের নেতা হযরত আয়তুল্লাহ ইমাম খোমেইনী (রহ:) বলেছিলেন বিশ্বের দেড়শ কোটি মুসলমান যদি এক গ্লাস করে পানি নিক্ষেপ করে তাহলে ইসরাইলের মতো অবৈধ রাষ্ট্র ভূমধ্যসাগরের সাথে মিশে যাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিশ্বে ৫০টির বেশি মুসলিম রাষ্ট্র থাকা সত্ত্বেও ইসরাইলের মতো ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমনকে নিধন করার জন্য কেউ সেভাবে এগিয়ে আসেনি। যেসব মুসলিম রাষ্ট্র কিংবা রাষ্ট্রপ্রধানরা ইসলামের পক্ষে কথা বলেন তাঁরাও সেভাবে এগিয়ে আসেননি, এটা খুবই দুঃখজনক। শুধু লেবাননের হিযবুল্লাহ, ইয়েমেনের হুতি, সিরিয়া এবং ইরাকের সামরিক সংগঠনগুলো ইসরাইলের বিরুদ্ধে বাস্তব ক্ষেত্রে অবস্থান নিয়েছে। আমরা আশা করি এদের অনুসরণে অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রও ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার জন্য এবং ইসরাইলের মতো মানবতার দুশমন নিধনের অভিযানে শামিল হবে। যারা ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেওয়ার অবস্থান থেকে সরে এসে ইসরাইল ও ফিলিস্তিন দুই রাষ্ট্রের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে তাদের প্রতিও আমাদের আবেদন ইসরাইলের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখে কোনোদিন মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি স্থাপন সম্ভব নয়। শান্তির একটাই পথ, সেটা হচ্ছে জায়নবাদী হানাদারদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলকে বিশ্ব মানচিত্র থেকে নিঃশেষ করে দেওয়া।

বর্তমান পরিস্থিতিতে মুসলমানদের দায়িত্ব হচ্ছে ফিলিস্তিনের সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনকে সমর্থন করার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ফিলিস্তিনের ব্যাপারে সোচ্চার ভূমিকা পালন করা; আন্তর্জাতিক আদালতে ইসরাইলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন মানতে বাধ্য করার জন্য ইসরাইলের উপর চাপ সৃষ্টি; ইসরাইলের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছেদ করা, তারা যেন কোনোভাবেই মুসলিম বিশ্বের নিকট থেকে অর্থনৈতিক সুবিধা লাভ করতে না পারে সেজন্য বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া এবং ইসরাইলি পণ্য বর্জন করা; কূটনৈতিক পর্যায়ে ইসরাইলকে কোণঠাসা করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা হাতে নেওয়া; সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ইসরাইলকে বয়কট করা; ফিলিস্তিনের নির্যাতিত মানুষের পক্ষে জনমত তৈরিতে ব্যাপক জনসংযোগ ও প্রতিবাদ সভা-সমাবেশের আয়োজন; বিশ্বমিডিয়ার অপপ্রচারের বিপক্ষে শক্তিশালী মিডিয়া প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সত্যকে তুলে ধরা ইত্যাদি।

ফিলিস্তিনের জনগণের দুর্ভোগ লাঘবে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ ত্রাণ সরবরাহের ব্যবস্থা করা, আহত ও অসুস্থদের চিকিৎসাসেবাকে নিশ্চিত করা, তাদের প্রতি অর্থনৈতিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া এখন মুসলিম উম্মাহ ও মুসলিম দেশগুলোর আশু কর্তব্য।

বিশ্বের প্রায় ২০০ কোটি মুসলমানের অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা, আল-কুদসের মুক্তি এবং ইসরাইলের ধ্বংসের জন্য প্রার্থনা করা। সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন বিশ্ব শান্তির অন্তরায়, ইসলাম ও মানবতার শত্রু ইসরাইলের মতো অবৈধ রাষ্ট্রের পতন ঘটবে এবং স্বাধীন ফিলিস্তিন ও আল-কুদস হায়েনাদের কবল থেকে মুক্তি পাবে ইনশাআল্লাহ।

লেখক: সম্পাদক, দৈনিক আজকের ভোলা এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট, আল-কুদস কমিটি বাংলাদেশ।

# শহীদ কাসেম সোলায়মানী : পশ্চিম এশিয়ায় মার্কিন চক্রান্ত নস্যাতের মহানায়ক

নূর হোসেন মজিদী

পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলের জনগণের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র নস্যাতের মহান নায়ক জেনারেল কাসেম সোলায়মানীর শাহাদাতের পর প্রায় পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে, কিন্তু তিনি ঐ অঞ্চলে যে গুরুত্বপূর্ণ ভাগ্যনির্ধারণী ভূমিকা পালন করেন তার সুফল অব্যাহত আছে এবং চূড়ান্ত লক্ষ্যে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের ইসলামি বিপ্লবের রক্ষী বাহিনী (পস্‌দর/আইআরজিসি)-এর কুদ্‌স ব্রিগেডের অধিনায়ক জেনারেল কাসেম সোলায়মানী ২০২০ সালের ৩রা জানুয়ারি ইরাকের প্রধানমন্ত্রী আদেল আবদুল মাহদীর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে ইরাকে গেলে বাগদাদ বিমান বন্দরের নিকটে মার্কিন ড্রোন হামলায় শাহাদাত বরণ করেন।

এখানে স্মর্তব্য যে, যুদ্ধের অবস্থায় ব্যতীত কোনো সৈনিক বা সেনানায়ককে হত্যা করা আন্তর্জাতিক আইনে বেসামরিক লোকদের হত্যার ন্যায়ই মানবাধিকারবিরোধী অপরাধ। প্রশ্ন হচ্ছে, এমতাবস্থায় সমস্ত রকমের আন্তর্জাতিক রীতিনীতি ও বিধিবিধানের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি প্রদর্শন করে কেন আমেরিকা কাপুরুষোচিতভাবে জেনারেল কাসেম সোলায়মানীকে হত্যা করলো?

পশ্চিম এশিয়ার সার্বিক পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এবং সেই সাথে জনারেল কাসেম সোলায়মানীর হত্যা প্রসঙ্গে স্বয়ং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের প্রতিক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি দিলে খুব সহজেই এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়। তা হচ্ছে, দূরদর্শী সুপরিকল্পনাবিদ জেনারেল কাসেম সোলায়মানী তাঁর শাহাদাত-পূর্ববর্তী ২২ বছরের অধিনায়কত্বকালে যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তার ফলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তার পৃষ্ঠপোষকতাধীন যায়নবাদী অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলের আধিপত্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সম্ভাবনা নস্যাৎ হয়ে গিয়েছে।

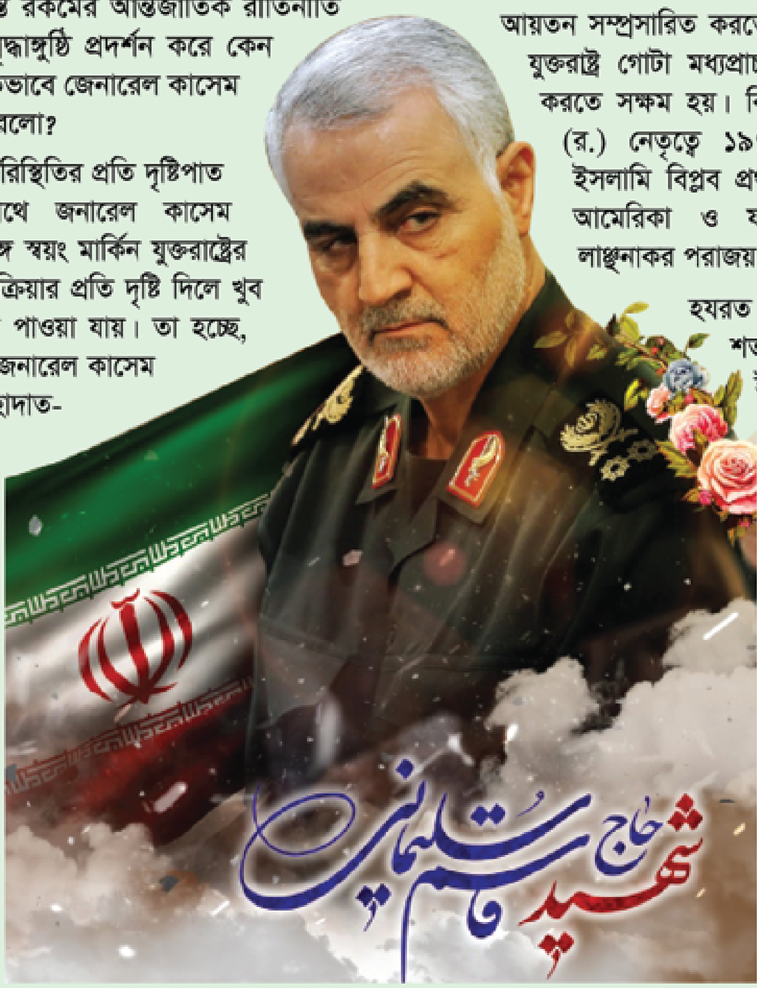


আন্তর্জাতিক যায়নবাদী সংস্থা ফিলিস্তিন সহ আশেপাশের আরব এলাকা নিয়ে বৃহত্তর ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দূরপ্রসারী দুষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রধানত বৃটেনের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং সেই সাথে অন্যান্য পাশ্চাত্য শক্তির সহায়তায় সারা দুনিয়া থেকে অ-ফিলিস্তিনি ইয়াহূদীদেরকে ফিলিস্তিনে এনে জড়ো করে এবং ফিলিস্তিনি জনগণের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যাকে হত্যা ও তাদের বাড়ি-ঘর-ভূখণ্ড থেকে জবরদস্তি করে উৎখাতের মাধ্যমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল প্রতিষ্ঠা করে। অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বপরিস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পুঁজিবাদী বিশ্বের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হয়ে পুরনো উপনিবেশবাদের স্থলে পর্দান্তরাল থেকে সরকারগুলোকে নিয়ন্ত্রণের নতুন ঔপনিবেশিক নীতি গ্রহণ করে। ফলত বৃটেনের পরিবর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যায়নবাদী ইসরাইলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও রক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ইসরাইল ও আমেরিকা নিজ নিজ স্বার্থোদ্ধারের লক্ষ্যে পরস্পরের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজে সহযোগিতা করতে থাকে। ফলত একদিকে ইসরাইল যেমন ফিলিস্তিনিদের হত্যা ও উৎখাতের মাধ্যমে তার প্রতিষ্ঠাকালীন আয়তন সম্প্রসারিত করতে সক্ষম হয় অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গোটা মধ্যপ্রাচ্যকে তার তাঁবেদারে পরিণত করতে সক্ষম হয়। কিন্তু হযরত ইমাম খোমেইনীর (র.) নেতৃত্বে ১৯৭৯ সালে সংঘটিত ইরানের ইসলামি বিপ্লব প্রথম বারের মতো সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা ও যায়নবাদী ইসরাইলের ওপর লাঞ্ছনাকর পরাজয় চাপিয়ে দেয়।

হযরত ইমাম খোমেইনী (র.) বিশ শতকের ষাটের দশক থেকেই ইসলামের প্রথম কিবলাহ ও রাসূলুল্লাহর মি‘রাজ গমনস্থল বায়তুল মুক্বাদ্দাস সহ কোরআন মজীদে উল্লিখিত পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিনকে যায়নবাদী ইসরাইলের কবল থেকে উদ্ধারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে আসছিলেন। অতঃপর ইসলামি বিপ্লবের মাধ্যমে ইরানের ওপর মার্কিন আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ খতম হওয়ার সাথে সাথে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান সমগ্র ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের ওপর ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত

জনগণের জন্য একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদানকে স্বীয় স্থায়ী নীতি হিসেবে গ্রহণ করে। এ কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও যায়নবাদী ইসরাইলের স্বার্থে তৎকালীন ইরাক সরকারের মাধ্যমে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। কিন্তু ইসরাইল, আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের মার্কিন তাঁবেদার সরকারগুলোর প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সহায়তাপুষ্ট হয়ে ইরাকের সাদ্দাম সরকার এ যুদ্ধ আট বছরব্যাপী অব্যাহত রেখেও তাদের লক্ষ্যে উপনীত হতে ব্যর্থ হয়।

অন্যদিকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান মুসলিম উম্মাহ্‌কে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও যায়নবাদী ইসরাইল সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন করতে সক্ষম হয়। শুধু তা-ই নয়, ইরানের ইসলামি বিপ্লবের প্রেরণায় যথাক্রমে ফিলিস্তিনি ও লেবাননের মুসলমানদের মধ্যে ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন হামাস ও হিযবুল্লাহ গড়ে ওঠে এবং ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান সরকারের সর্বাত্মক সহযোগিতায় একদিকে যেমন হামাস ইসরাইলের নিয়মিত বিমান হামলাকে উপেক্ষা করে ফিলিস্তিনের গাযা ভূখণ্ডকে ইসরাইলবিরোধী প্রতিরোধ দুর্গে পরিণত করে, অন্যদিকে হিযবুল্লাহ শুধু লেবানন থেকে দখলদার ইসরাইলি বাহিনীকে বিতাড়িত করেনি, বরং ফিলিস্তিনি মুসলমানদের মুক্তিসংগ্রামকে সর্বাত্মক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের লক্ষ্যে অনবরত উত্তর ইসরাইলের সামরিক লক্ষ্যবস্তুসমূহের ওপর হামলা চালিয়ে আসছে।

যেহেতু ফিলিস্তিনের ও লেবাননের সাথে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের ভৌগোলিক সীমান্ত নেই সেহেতু ইসলামি বিপ্লবের বিজয়ের পর থেকেই ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান সরকার মধ্যপ্রাচ্যের একমাত্র ইসরাইলবিরোধী দেশ সিরিয়াকে অবারিত সাহায্য-সহায়তা দিয়ে দেশটিকে আমেরিকা ও ইসরাইলের আধিপত্যের বাইরে ধরে রাখতে এবং সিরীয় ভূখণ্ডের মধ্য দিয়ে হামাস ও হিযবুল্লাহকে সর্বাত্মক সাহায্য সরবরাহ অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়। এ কারণে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা হামাস ও হিযবুল্লাহর কাছে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাহায্য পৌছানোর রুট বন্ধ করার লক্ষ্যে সিরিয়ার ওপর স্বীয় আধিপত্য চাপিয়ে দেয়ার জন্য তার তাঁবেদারদের দ্বারা একাধিক বিদ্রোহ সৃষ্টি করে।

আমেরিকার উস্কানি ও সহায়তায় সৃষ্ট এ সব বিদ্রোহের ব্যর্থতার পর সবশেষে আমেরিকার হাতে গড়া তথাকথিত ইসলামিক স্টেট (আইএস) সন্ত্রাসীরা দেশটির উল্লেখযোগ্য পরিমাণ এলাকা দখল করে নিতে সক্ষম হয়। এমতাবস্থায় ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান আমেরিকা ও ইসরাইলের পৃষ্ঠপোষকতাপুষ্ট আইএস-কে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে সিরিয়া সরকারের প্রতি সর্বাত্মক সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয় এবং এ ক্ষেত্রে সাফল্যের কৃতিত্বের সিংহভাগই শহীদ জেনারেল কাসেম সোলায়মানীর।

জেনারেল কাসেম সোলায়মানী একজন সামরিক অধিনায়ক হলেও তাঁর দক্ষতা শুধু রণাঙ্গনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি একই সাথে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক দক্ষতারও অধিকারী ছিলেন এবং সুদক্ষ সংগঠক ছিলেন। তিনি তাঁর দূরদর্শিতার কারণে একদিকে যেমন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্যের সম্প্রসারণ প্রতিহত করার অভিন্ন স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে সিরিয়ায় আইএস-সন্ত্রাসীদের নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে এ ক্ষেত্রে রাশিয়ার সামরিক সহায়তা গ্রহণের প্রয়োজন অনুভব করেন এবং প্রধানত তাঁরই উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার ফলে রাশিয়া এ ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করে, অন্যদিকে তিনি সমগ্র আরব জাহানে ইসরাইল ও আমেরিকার বিরোধী ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলারও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

এটা সুস্পষ্ট যে, যায়নবাদী ইসরাইল রাষ্ট্রকে উৎখাত করে সমগ্র ফিলিস্তিন ভূখণ্ড জুড়ে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে ফিলিস্তিনের প্রতিবেশী আরব দেশগুলোর সহায়তা লাভ অপরিহার্য। কিন্তু আরব জনগণের একটা বিরাট অংশ ইসলামি উম্মাহ্‌র চেতনার অধিকারী হলেও এবং ফিলিস্তিনি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে একাত্ম হলেও একমাত্র সিরিয়া সরকার ব্যতীত সকল আরব দেশের সরকারই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাঁবেদার হিসেবে ইসরাইলের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ মিত্র। এ কারণে জেনারেল কাসেম সোলায়মানী আরব দেশসমূহে আমেরিকা ও ইসরাইলের বিরোধী ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার কর্মসূচি গ্রহণ করেন।

জেনারেল কাসেম সোলায়মানীর পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টায় ইরাক ও সিরিয়ার মুসলমানদের মধ্যে ইসরাইল-আমেরিকা বিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠেছে এবং ইতিমধ্যেই তারা আমেরিকার তৈরি ও পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত সন্ত্রাসী গোষ্ঠী আল-কায়েদাহ্‌ ও আইএস-এর বিরুদ্ধে যথাযথ ভূমিকা পালন

করেছে এবং ইরাকস্থ মার্কিন সামরিক ঘাঁটির ওপরও একাধিক বার হামলা চালিয়েছে। অন্যদিকে হুথী হিসেবে সমধিক পরিচিত ইয়েমেনের দ্বীনদার মুসলমানদের সংগঠন আনসারুল্লাহ্ প্রধানত জেনারেল কাসেম সোলায়মানীর প্রচেষ্টায় হামাস ও হিযবুল্লাহর ইসরাইলবিরোধী সংগ্রামের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছে এবং ইসরাইল ও আমেরিকার বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিগত দুই দশক যাবত তার পশ্চিম এশিয়া নীতিতে কয়েকটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে আসছে, তা হচ্ছে : ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের শক্তিশালী অবস্থানকে ধ্বংস করা বা নিদেন পক্ষে দুর্বল করা, আমেরিকা ও ইসরাইলের বিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলনগুলোকে নিশ্চিহ্ন করা, পশ্চিম এশিয়ায় স্বীয় অবস্থানকে পুনর্গঠিত করা এবং যায়নবাদী ইসরাইল সরকারকে সকল প্রকার হুমকি থেকে মুক্ত করা।

আমেরিকান ভাষ্যকার স্টিফেন ল্যান্ডম্যান বলেন : আমেরিকা কখনই পশ্চিম এশিয়া বিষয়ক নীতি পরিবর্তন করবে না। ওয়াশিংটনের এ নীতির লক্ষ্য হচ্ছে ঐ অঞ্চলের দেশগুলোকে দুর্বল করা এবং তাদের প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন করা ও তা স্বীয় সাম্রাজ্যবাদী অংশীদারদের সাথে মিলে ভোগ করা। তাই যতদিন পর্যন্ত ঐ অঞ্চলে প্রভূত তেলসম্পদ থাকবে ততদিন পর্যন্ত সেখানে আমেরিকান বাহিনীর হস্তক্ষেপমূলক উপস্থিতি অব্যাহত থাকবে।

কিন্তু প্রধানত জেনালের কাসেম সোলায়মানী কর্তৃক প্রণীত দূরদর্শী পরিকল্পনার ফলশ্রুতিতে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা তার এ লক্ষ্যসমূহ অর্জনের ক্ষেত্রে দারুণভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলের বর্তমান পরিস্থিতির পর্যালোচনা করলে সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, ঐ অঞ্চলের পরিবর্তনসমূহ আমেরিকান স্ট্র্যাটেজি ও স্বার্থের বিপরীত দিকে এগিয়ে চলেছে। কারণ, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের অবস্থান যে দুর্বল হয়নি শুধু তা-ই নয়, বরং ঐ অঞ্চলের অনেক দেশই উক্ত অঞ্চলে ইরানের শক্তিশালী অবস্থান মেনে নিয়েছে এবং ইরানের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কারণ, শহীদ কাসেম সোলায়মানী কর্তৃক গৃহীত ও বাস্তবায়িত পরিকল্পনার ফলে আমেরিকা ঐ অঞ্চল থেকে প্রতিরোধ শক্তিগুলোকে উৎপাটন করতে ও স্বীয় অবস্থানকে সুসংহত করতে মোটেই সক্ষম হয়নি, বরং ইসলামি বিপ্লবের বর্তমান রাহবার হযরত আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ীর মূল্যায়ন অনুযায়ী, বর্তমানে পশ্চিম এশিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আমেরিকা-বিতাড়নের গণচেতনা।

অধিকন্তু যায়নবাদী ইসরাইল সরকার আমেরিকার নেতৃত্বাধীনে আরব দেশসমূহের সাথে তার সম্পর্ক স্বাভাবিক করার মাধ্যমে স্বীয় অবস্থানকে সুসংহত করার যে উদ্যোগ নিয়েছিল গত ৭ই অক্টোবর ২০২৩ তারিখ থেকে গাযার প্রতিরোধ আন্দোলন হামাস কর্তৃক সূচিত 'আল-আক্সা ঝড়' নামক অভিযান এবং তাদের সমর্থনে যায়নবাদী ইসরাইলের বিরুদ্ধে হিযবুল্লাহর হামলা যায়নবাদী ইসরাইলের ওপর বিরাট পরাজয় চাপিয়ে দিয়েছে এবং ফলত যায়নবাদী ইসরাইল আগের মতোই স্বীয় অস্তিত্বকে হুমকির সম্মুখীন বলে অনুভব করছে।

আর এভাবে আমেরিকা যে পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলে তার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে এর পিছনে যে সব কারণ কাজ করেছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণ ছিল শহীদ কাসেম সোলায়মানীর উদ্ভাবনমূলক পরিকল্পনা। আমেরিকার সরকারি ও বেসরকারি মহলের অনেক পর্যবেক্ষকই এটা স্বীকার করেছেন এবং এ কারণে তাঁদের অনেকে তাঁকে আমেরিকার 'প্রথম শ্রেণির দুশমন' ও 'সম্মানার্হ দুশমন' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

**জেনারেল কাসেম সোলায়মানীর পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টায় ইরাক ও সিরিয়ার মুসলমানদের মধ্যে ইসরাইল-আমেরিকা বিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠেছে এবং ইতিমধ্যেই তারা আমেরিকার তৈরি ও পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত সন্ত্রাসী গোষ্ঠী আল-কায়েদাহ্ ও আইএস -এর বিরুদ্ধে যথাযথ ভূমিকা পালন করেছে এবং ইরাকস্থ মার্কিন সামরিক ঘাঁটির ওপরও একাধিক বার হামলা চালিয়েছে।**

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ২০১৪ সালে ইরাকের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হায়দার আল-'এবাদীর সাথে এক সাক্ষাতে জেনারেল কাসেম সোলায়মানী সম্পর্কে মন্তব্য করেন : তিনি আমার দুশমন, কিন্তু আমি তাঁকে সম্মান করি।

মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীর সাবেক সর্বাধিনায়ক জেনারেল ডেভিড পেট্রাউস বলেন : কাসেম সোলায়মানী অত্যন্ত সক্ষম ও সুপরিচালক ব্যক্তি এবং সম্মানার্হ দুশমন ছিলেন; তিনি তাঁর খেলাটা অত্যন্ত ভালোভাবে আঞ্জাম দিতেন।

মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীর সাবেক গোয়েন্দা কর্মকর্তা স্কট রিটার শহীদ কাসেম সোলায়মানী সম্পর্কে চমৎকার কথা বলেছেন; তিনি বলেন : সোলায়মানী ছিলেন একজন সফল জেনারেল ও কূটনীতিক – যিনি খেলাটা আমাদের চেয়ে অনেক ভালোভাবে আঞ্জাম দেন এবং পুরো খেলাতেই আমাদেরকে পরাজিত করেন; ফলত আমাদের সামনে তাঁকে হত্যা করা ব্যতীত কোনো পথই খোলা ছিল না।

মার্কিন সাময়িকী নিউ ইয়র্কার-এর লেখক ডেক্সটার ফিলকিন্স শহীদ কাসেম সোলায়মানী কর্তৃক প্রকাশ্য সামরিক দায়িত্বের বাইরে পশ্চিম এশিয়ায় বিভিন্ন প্রতিরোধ সংগঠন গড়ে তোলার মাধ্যমে আমেরিকার পশ্চিম এশিয়া বিষয়ক নীতিকে ব্যর্থ করে দেয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে 'ছায়া অধিনায়ক' (Shadow Commander) হিসেবে অভিহিত করেন এবং এরপর মার্কিন সাময়িকী আটলান্টিক ও বার্তাসংস্থা এএফপি সহ বিভিন্ন পাশ্চাত্যের প্রচারমাধ্যম কর্তৃক এর পুনরুক্তি করা হয়।

এখানে প্রশ্ন জাগে যে, শহীদ কাসেম সোলায়মানীর এ অভাবনীয় সাফল্যের পিছনে মূল কারণ কী ছিল?

শহীদ কাসেম সোলায়মানীর এ সাফল্যের পিছনে মূল কারণ ছিল ইরানের ইসলামি বিপ্লবের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। এ বিপ্লবের পিছনে মূল চেতনা ছিল কেবল আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য কাজ করার ঈমানী চেতনা এবং এ কারণে এ বিপ্লবের দল-মতের উর্ধ্বে গণবিপ্লব হিসেবে গড়ে ওঠার বৈশিষ্ট্য – সঠিক বিপ্লবী দ্বীনী নেতৃত্বের অধীনে যে চেতনা প্রজন্মান্তরে অব্যাহত আছে। এ কারণেই বিপ্লব বিজয়ের পর থেকে বিগত প্রায় ৪৬ বছর যাবত ভিতর-বাইরের বহু প্রতিকূলতা ও কঠিন পরীক্ষা সাফল্যের সাথে মোকাবিলা করে এ বিপ্লবের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব হয়েছে – যা ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের বাইরেও বহু মুসলমানকে, বিশেষত ফিলিস্তিন, লেবানন, ইয়েমেন, ইরাক ও সিরিয়ার অনেক মুসলমানকে শাহাদাতের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা ও যায়নবাদী ইসরাইলের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রাম

ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল মোহাম্মদ বাকেরির সঙ্গে

অব্যাহত রাখার প্রেরণা যুগিয়েছে।

এ বৈপ্লবিক চেতনার কারণেই লেবাননের প্রতিরোধ আন্দোলন হিযবুল্লাহ জান-মালের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করেও বছরের পর বছর ধরে যায়নবাদী ইসরাইলকে শুধু প্রতিরোধই করে যাচ্ছে না, বরং উত্তর ইসরাইলে অনবরত হামলা চালিয়ে যায়নবাদীদেরকে দিশাহারা করে তুলেছে। অন্যদিকে আজ ফিলিস্তিনে নতুন প্রজন্মের ভিতরে এমন বিভিন্ন প্রতিরোধশক্তি গড়ে উঠেছে যারা তাদের প্রতিরোধমূলক অভিযানকে যায়নবাদী ইসরাইলের দখলাধীন এলাকায় বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া ইরাকের বুক থেকে সামরিক ঘাঁটি তুলে নিতে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকাকে বাধ্য করার লক্ষ্যে ইরাকে একাধিক প্রতিরোধ শক্তি গড়ে উঠেছে– যারা আপোসহীনভাবে প্রতিরোধ অব্যাহত রেখেছে এবং অনবরত মার্কিন সামরিক ঘাঁটির ওপর হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। তেমনি ইয়েমেনের হুথী মুসলমানদের বৈপ্লবিক প্রতিরোধ শক্তি আনসারুল্লাহ্ গাযার মুসলমানদের সপক্ষে যথাযথ সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে এবং সাম্প্রতিক যুদ্ধে তারা ইসরাইল অভিমুখী বহু জাহাজের ওপর মিসাইল নিক্ষেপ করে যায়নবাদী সরকারের ওপর বিরাট ক্ষতি চাপিয়ে দিয়েছে।

যায়নবাদী অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল ও তার পৃষ্ঠপোষক সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদী আমেরিকার বিরুদ্ধে গাযা, লেবানন, ইরাক, সিরিয়া ও ইয়েমেনের দৃশ্যমান প্রতিরোধ আন্দোলনসমূহ ছাড়াও পশ্চিম এশিয়ার অন্যান্য দেশেও আমেরিকা ও যায়নবাদবিরোধী ইসলামি চেতনার বিস্তার লাভ ঘটছে। আর এর কৃতিত্বের একটি বিরাট অংশই শহীদ কাসেম সোলায়মানীর পরিকল্পনার।

সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা ধারণা করেছিল যে, জেনারেল কাসেম সোলায়মানীকে হত্যার মাধ্যমে পশ্চিম এশিয়ায় আমেরিকা ও ইসরাইলবিরোধী প্রতিরোধকে স্তিমিত করে দিতে সক্ষম হবে। কিন্তু আমেরিকার হিসাব-নিকাশ সম্পূর্ণরূপে ভুল ছিল। কারণ, যে চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শহীদ কাসেম সোলায়মানী মধ্যপ্রাচ্যের বুকে যায়নবাদ ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন সে চেতনা ব্যক্তিবিশেষের অস্তিত্বের ওপর নির্ভরশীল নয়; বরং এ চেতনাই শহীদ সোলায়মানীর ন্যায় ব্যক্তিত্বকে গড়ে তুলেছিল এবং নিঃসন্দেহে এ ধরনের আরো অনেক ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে – যারা দৃশ্যমান না হলেও নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে চলেছেন।

পরিশেষে স্মরণ করিয়ে দিতে হয় যে, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান একদিকে যেমন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও যায়নবাদী ইসরাইলের বিরুদ্ধে গোটা পশ্চিম এশিয়ায় প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তুলেছে তেমনি তার পাশাপাশি স্বীয় সামরিক শক্তি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে; শুধু তা-ই নয়, এমন এক সামরিক স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ করেছে যার মোকাবিলা করা আমেরিকা ও ইসরাইলের পক্ষে সম্ভব নয়।

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান কেবল লক্ষ লক্ষ মিসাইল তৈরি করেনি; বরং কেবল সামরিক ঘাঁটিতে মিসাইল মোতায়েন করার পরিবর্তে বিশাল ইরানি ভূখণ্ডের পাহাড়-পর্বত, মরুভূমি ও বনজঙ্গল সহ সর্বত্র অসংখ্য মিসাইল মোতায়েন করেছে। ফলত আমেরিকা ও ইসরাইল যদি ইরানের বিরুদ্ধে এমনকি পারমাণবিক হামলা চালিয়ে দেশটির শহরগুলো ধ্বংস করার চেষ্টা করে তথাপি ইরানের পক্ষে তার আশেপাশে অবস্থিত মার্কিন সামরিক ঘাঁটি ও যুদ্ধজাহাজসমূহকে এবং যায়নবাদী ইসরাইলকে সহজেই ধ্বংস করে দেয়া সম্ভব হবে। এ কারণেই যায়নবাদী ইসরাইল কাপুরুষোচিতভাবে হামাস-নেতা ইসমাঈল হানীয়াহ্ ও হিযবুল্লাহ নেতা সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহকে হত্যা করার পর ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান ইসরাইলের বিরুদ্ধে যে প্রতীকী প্রতিশোধ-হামলা চালায় তাতে বিরাট ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন ইসরাইল ইরানের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের হুমকি দিলেও কার্যত ইসরাইল বা আমেরিকা ইরানে হামলা চালাতে সাহসী হয়নি।

# সুফিবাদের উৎস সন্ধান ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

ড. সাইফুল ইসলাম খান

ইসলামের আধ্যাত্মিক জগতের অতিপরিচিত বিষয় এলমে তাসাওউফ বা সুফিবাদ। বাইরের কোনো চিন্তাধারা থেকে কিংবা অন্য কোনো ধর্মের সংমিশ্রণে এর আবির্ভাব ঘটেনি। পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মহান বাণী ও পবিত্র জীবন আচরণ থেকে এর উৎপত্তি হয়েছে। পবিত্র কুরআন মানবজাতির শুধু জীবন-বিধান নয়, জীবন-দর্শনও বটে। তাই এ জীবন-দর্শনের সূক্ষ্ম তত্ত্ব থাকাটাই স্বাভাবিক এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই তা অনুধাবন করতে পারেন। আর এজন্যই পবিত্র কুরআনে বহুবার এসেছে 'তত্ত্বজ্ঞানীদের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন' (সূরা আররা'দ, আয়াত, ১৯)। সূরা আলহিজর এর ৭৫ নম্বর আয়াতে একটি বিশেষ ঘটনা উল্লেখের পর আল্লাহ বলছেন, 'নিশ্চয়ই এতে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন-চিন্তাশীল মানুষদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।' সুফিবাদের নির্যাস হলো একত্ববাদকে দেখা, একত্ববাদকে জানা এবং একত্ববাদের হাকিকতের উপর বেঁচে থাকা। হিজরি ৮ম শতকের পারস্যের বিখ্যাত সাধক ও সুফি শেখ মাহমুদ শাবেস্তারি তাঁর বহুল পরিচিত 'গুলশানে রায' (রহস্যের বাগান) গ্রন্থে বলেন, 'এককেই দেখো, এককেই বলো, এককেই জানো, এভাবেই অর্জন হবে তোমার ঈমানের মূল ও শাখা।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন প্রজ্ঞার আধার। জগৎ, জীবন ও সৃষ্টিকৌশল নিয়ে তিনি নির্জন নিশিথে আত্মবিভোর হয়ে যেতেন। তাঁর বহু হাদিস শরীফ রয়েছে যা নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞান ছাড়া সাধারণভাবে বুঝা প্রায় অসম্ভব। তিনি এরশাদ করেন : 'আমলসমূহের মধ্যে আল্লাহর পরিচয় জ্ঞান জানা উত্তম আমল। কেননা, আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কের জ্ঞান তোমার আমল কম বা বেশি যাই হোক তাতে বরকত দান করে। বিপরীতে আল্লাহ তাআলার পরিচয় জ্ঞানের অজ্ঞতা, না তোমাকে অল্প আমলে, না তোমাকে বেশি আমলে বরকত ও কল্যাণ দান করে।' (কানযুল উম্মাল, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪৩)

সুফিবাদ ইসলামের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থার সমন্বয়ে গঠিত এবং এতে মানবচরিত্র ঘনিষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ কিছু নিয়ম ও রীতি আবশ্যিকভাবে পালনীয় ও অনুসরণীয়। এর মধ্যে রয়েছে আত্মসমর্পণ, তওবা, আনুগত্য, ঐকান্তিকতা ও অনুরাগ, ধৈর্য, উদারতা, যিকির, সংগীত, আধ্যাত্মিক জ্ঞান, আধ্যাত্মিক রহস্য সন্ধান, তাকওয়া, এখলাস, তাওয়াক্কুল, এশকে এলাহি, কাশফ, হাল, ফানা ও বাক্বা ইত্যাদি। এই নীতিমালার অনুশীলনের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের সান্নিধ্য লাভ করা সহজ হয়।

তাই সুফিবাদ ইসলামের নিজস্ব সম্পদ এবং ইসলামি শরিয়তের আওতায় আপন স্বকীয়তায় উদ্ভাসিত হয়ে যুগে যুগে উন্নতির শিখরে আরোহণ করে মুসলিম দর্শনকে সারা বিশ্বের কাছে হৃদয়গ্রাহী ও অনুকরণীয় করে তুলেছে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত অনেক রহস্যাবৃত ঘটনা ও আয়াতে সুফি দর্শনের বীজ প্রোথিত।

সৃষ্টিগতভাবে মানুষ এক একক ও অভিন্ন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এক মহান অস্তিত্ব। তার এই অস্তিত্বে বহু অস্তিত্বের অবস্থান ও দিক বিদ্যমান। আমরা যখন বলি, 'আমি একজন মানুষ', সাথে সাথে আমার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে আমার চিন্তার জগৎ, আমার আশা-প্রত্যাশার জগৎ, আমার ভয়-ভীতির জগৎ, আমার ভালোলাগা না-লাগার জগৎ, আমার ভালোবাসা ভালো না-বাসার জগৎ ইত্যাদি। এসব মানব অস্তিত্বের বিষয়াদি যেন হাজারো নদী ও জল প্রবাহ হয়ে অসীম এক মোহনায় মিলিত হয় এবং এক মহাসমুদ্রের জন্ম দেয়। এ মহাসমুদ্রের গভীরতার তথ্য ও তত্ত্ব নিয়ে আজো কোনো মানবসন্তান দাবি করতে পারেননি যে, এ সম্পর্কে তিনি কোনো পূর্ণতা লাভ করেছেন। দার্শনিক, আধ্যাত্মিক সাধক ও মনোবিজ্ঞানীর মতো ধ্যানী, জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী সাধক শ্রেণি তাঁদের নিজ নিজ জ্ঞান ও প্রতিভা নিয়োগে এই

সুফি নৃত্য

গভীর মহাসমুদ্রের ডুবুরি হয়ে এর সীমিত রহস্যই উন্মোচন করতে সক্ষম হয়েছেন। তবে আরেফ ও আল্লাহ তাআলার ওলি-আউলিয়াগণ এক্ষেত্রে অধিকতর সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন।

পবিত্র কুরআনুল কারীমে 'ক্বালব' বলতে যা বোঝানো হয়েছে মানব দেহের অস্তিত্বে লুক্কায়িত সেই মহাসমুদ্রকে আমরা পবিত্র কুরআনুল হাকীমে বর্ণিত রূহ হিসেবে অনুধাবন করি। আল্লাহ তাআলা সূরা আল-হিজরের ২৯ নম্বর আয়াতে বলেন : 'যখন আমি তাকে সুগঠিত পূর্ণ আকৃতি দান করব এবং তাতে আমার রূহ থেকে ফুঁক দেব, তখন তোমরা তার সামনে সেজদায় পড়ে যেও।' সূরা বনী ইসরাইলের ৮৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন : '(হে নবী!) তারা তো আপনাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। আপনি বলে দিন, রূহ হলো আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি নির্দেশ (মহাশক্তি)। আর (এ সম্পর্কিত) জ্ঞানের খুব সামান্য অংশই তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে।' মানব অস্তিত্বে আল্লাহ তাআলার মহাপবিত্র যাত থেকে এটি এক মহাশক্তি ও মহাবিস্ময়। মহাজ্ঞান, অসীম প্রজ্ঞা ও গুণের মহান ধারক এই আদম সন্তান। আমরা মানব অস্তিত্বের বাহ্যিক রূপ ও সৌন্দর্য দেখে বিমোহিত হই, অনেক সময় নিজেকে হারিয়ে ফেলি। অথচ এই ক্ষণস্থায়ী ও ক্ষণভঙ্গুর দৃশ্যমান মানবকাঠামোর ভেতরে যে মহাশক্তি ও মহাপবিত্রের বসবাস এবং সেটি যে প্রতিক্ষণে প্রতি মুহূর্তে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ পাকের সাথে সংযুক্ত, দুনিয়ার মোহ আর শয়তানের নানাবিধ প্রলোভন-প্ররোচনায় মানুষ তা বেমালুম ভুলে থাকেন। হযরত জালালুদ্দিন রুমি মানুষের এই বেদনার্ত ও করুণ পরিণতিকেই ভয়ানক বন্দিশালা হিসেবে অভিহিত করেছেন।

ইসলামে এলমে তাসাউফ ও এলমে মারেফাত চর্চা ও অনুশীলনে আল্লাহ তাআলার বাণী- 'আল্লাহর রঙে রঙিন হও। আল্লাহর রঙের চেয়ে সুন্দর রঙ আর কার হতে পারে? আমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করি' (সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত ১৩৮), অনুধাবন করে বুঝতে পারি আল্লাহ তাআলার সাথে বান্দার সম্পর্ক ও বান্দার উপর তাঁর প্রভাব কত গভীর, কত নিবিড় ও কত অকল্পনীয়। এ প্রকৃতির বান্দাগণ আল্লাহ তাআলার ওলি বা আপন বন্ধুতে পরিণত হন। এদের সম্পর্কেই পবিত্র কুরআনুল কারীমের সূরা ইউনুসের ৬২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : 'জেনে রেখো! আল্লাহর ওলিগণের কোনো ভয় নেই এবং কখনো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে হবে না।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিসে কুদসিতে আল্লাহর ওলিগণের শান ও মর্যাদা সম্পর্কে বলেছেন : 'যে আমার ওলি বা বন্ধুর সাথে শত্রুতা করে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি।' (বুখারি শরীফ, হাদিস নং ৬৫০২)

তাই একজন মানুষ পবিত্র শরিয়তের বিধিবিধান পূর্ণ প্রতিপালনের পরও প্রশ্ন থেকে যায় মানুষটি সার্বিক দিক বিবেচনায় পরিশুদ্ধ, পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হতে পেরেছেন কিনা। এ

প্রশ্ন ও প্রত্যাশার আলোকেই নবী-রাসূলগণের নিকট প্রেরিত ঐশী বাণী ওহীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মানুষ উম্মত হয়েছেন, সাহাবী হয়েছেন, অনুসারী হয়েছেন। এসব হেদায়েতপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে সবকালেই এমনসব তাপস ধ্যানী জ্ঞানী সাধক বুজুর্গ আলেম ও পবিত্র কুরআনের পরিভাষা অনুযায়ী ওলি-আউলিয়ার আবির্ভাব ঘটেছে এবং ঘটে চলেছে- যাঁদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের পর 'সাদেক্বীন', 'উলুল আমর' এবং 'সালিহ'গণের দলভুক্ত করা হয়েছে। সূরা আল ফাতিহায় এরাই হচ্ছেন নেয়ামতপ্রাপ্ত শ্রেণির একটি শ্রেণি। দুনিয়ার সকল প্রকার দায়িত্ব ও কর্ম প্রতিপালনে একজন আত্মশুদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি যে পরিমাণ সততা ও পবিত্রতা নিয়ে মানবসেবায় সমৃদ্ধি দান করতে পারেন, অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য মানুষকে সে স্তরে নিয়ে যেতে পারে না। একজন মানুষের চিন্তার পরিশুদ্ধি ও আত্মশুদ্ধির মাত্রার অনুপাতই নির্ধারণ করে যে, তিনি কতটা দুর্নীতিমুক্ত ও সততানির্ভর কর্মজীবন পরিচালনা করতে পারবেন। পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসে বহু রাজা-বাদশা তাঁদের কর্ম পরিচালনা ও রাজ্য শাসনে এসব ধ্যানী-জ্ঞানী ও ওলি-আউলিয়ার দ্বারস্থ ও শরণাপন্ন হয়েছেন। তাঁদের উপদেশ ও পরামর্শে অনেক ভুল কর্ম ও অকল্যাণ পদক্ষেপ থেকে জনগণ ও জনপদ রক্ষা পেয়েছে।

কালে কালে ও দেশে দেশে এই পথ পরিক্রমার যাঁরা সাথি হয়েছেন, মানবসভ্যতার ইতিহাসে তাঁরাই ওলি-আউলিয়া, সুফি-দরবেশ, গাউছ-কুতুব, পীর-মাশায়েখ ও মুরশিদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। ইসলামের ইতিহাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে শুরু করে এই শ্রেণির মহান সাধকগণই শান্তির দ্বীন ও ধর্ম ইসলামের শিক্ষা, ইসলাম গ্রহণ এবং এর প্রচার ও প্রসারে অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছেন।

আরবে সুফিবাদের উৎপত্তি ঘটলেও এর উৎকর্ষ সাধনে শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছেন পারস্যবাসিগণ। সেখানে অগণিত সুফি-দরবেশের আগমন ঘটেছে। সুফিবাদের ভিত্তি ছিল দারিদ্র্য ও নির্জনতা। অনুতাপ ও সাধনাকে অন্তর পরিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার প্রবেশ দ্বার হিসেবে বিবেচনা করা হতো, যাকে সুফিগণ সত্যজ্ঞানের উৎস বলে মনে করতেন। যিকির, বিশেষ করে সুপ্ত যিকির ছিল সত্যের সাথে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত হওয়ার মাধ্যম, আর তাতে অবহেলো করাকে আত্মপ্রবঞ্চনা ও অমর্যাদাকর হিসেবে গণ্য করা হতো। যিকিরের বিষয়ে সতর্কতা, বিশেষ করে খানকাসমূহের গোপনীয়তায়, যিকিরকারীকে সত্যের পথ দেখাতো, যিনি একজন পীর বা মুরশিদের নেতৃত্ব সেই আলোর পথে প্রবেশ করতেন এবং তাঁর সুফি ভাবধারামূলক আচরণের পুনরাবৃত্তি ও অনুশীলন দ্বারা নিজেকে সেই উচ্চ মাকামের দিকে এগিয়ে নিতেন, যতক্ষণ না তাঁর সমগ্র অস্তিত্ব সত্যের প্রকাশে পরিপূর্ণ হতো। একজন মনীষী চিন্তা ও যুক্তির মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জন করেন, একজন সুফি নির্জনতার তপস্যা ও সাধনার মাধ্যমে সেই একই জ্ঞান লাভ করতে পারেন। জ্ঞানচর্চা ও যুক্তিবিদ্যার প্রতি এহেন অবজ্ঞা সুফিগণকে ফকিহ ও ধর্মতত্ত্ববিদদের দৃষ্টিতে তিরস্কারের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। সুফি ও মুসলিম পণ্ডিতদের মধ্যকার বিরোধিতা ও প্রত্যাখ্যানের সীমা এমনকি হত্যা পর্যন্ত গড়িয়েছিল, যার অন্যতম দৃষ্টান্ত হলো হযরত মনসুর হাল্লাজ ও হযরত আইনুল কুযাত হামেদানির শাহাদাত। তাঁরা উভয়েই মারাত্মক সংঘর্ষের শিকার হয়েছিলেন। সুফিগণ দার্শনিক যুক্তিকে অবজ্ঞা করেন, 'অন্য' ও 'অদেখা' সত্যের অস্তিত্বকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন এবং সেই সত্যকে পথপ্রদর্শক হিসেবে তুলে ধরে বাকি সবকিছুকে বিভ্রান্তিকর হিসেবে আখ্যা দেন। তাই সুফিদের 'তরিকত' এর সূচনা 'শরিয়ত' থেকে হলেও সেই সম্পর্ক কখনো কখনো দীর্ঘস্থায়ী হয় না এবং সেই 'পরম সত্য' ব্যতীত আর কিছুর সাথেই এটি পুরোপুরি মিলে না– না যুক্তি, না দর্শন। একজন সুফির মতে, প্রকৃত জ্ঞান হক্ব বা মহাসত্য, যা সত্য দিয়ে শুরু হয়, সত্যের সাথেই শেষ হয়ে যায়। (যাররিন কূব, পৃ. ১৫৭)

বাংলাদেশে 'সুফিবাদ' ও 'মরমিবাদ' সুফিকেন্দ্রিক বহুল প্রচলিত দুটি শব্দ। অধিকাংশ মুসলমানের ধারণা যে, ইসলাম ধর্ম শরিয়ত ও তরিকতের মধ্যে নিহিত। সুফিবাদ শুধু তরিকতের মধ্যে নিহিত এবং সুফিবাদ শুধু তরিকতের সাথে সম্পৃক্ততা রাখে– শরিয়তের সাথে নয়। এটি সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা। বস্তুত সুফিবাদের প্রথম সোপান হলো শরিয়ত। শরিয়ত পালন না করে এলে সুফিবাদে প্রবেশ করা যায় না। (গনি : ২০১০, ৫৩)। ইসলামের সুফিদর্শনের প্রবর্তক হলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনিই প্রথম ক্বলব বা আত্মার পরিশুদ্ধির কথা বলেছেন। এই শিক্ষা তিনি নিজ জামাতা হযরত আলী (আ.)-কে দিয়েছিলেন। যে কারণে হযরত আলী (আ.)-কে সুফিবাদের শেকড় বলা হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে হযরত ইমাম হাসান (আ.), ইমাম হোসাইন (আ.), হযরত হাসান বসরী (র.) ও হযরত ওয়ায়েস করনি (র.) তাসাউফশাস্ত্রের দায়িত্ব লাভ করেন। আরবে সুফিবাদের উৎপত্তি ঘটলেও এর উৎকর্ষ সাধনে শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছেন পারস্যবাসী। সেখানে অগণিত সুফি-দরবেশের আগমন ঘটেছে। এছাড়া পারস্যের কবি-সাহিত্যিক, ধর্মবিদ, দার্শনিক ও আলেমগণ এ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। বস্তুত এলমে তাসাওউফকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য পদ্য ও গদ্য সাহিত্যে পারস্যবাসীর অবদান বিরল। এসবের দুয়েকটি রচনা ব্যতীত সকল গ্রন্থই ফারসি ভাষায় রচিত। উদাহরণ হিসেবে গদ্য গ্রন্থের মধ্যে শেহাব উদ্দিন ইয়াহইয়া সোহরাওয়ার্দী রচিত 'হিকমাতুল ইশরাক', আবু সাঈদ আবুল খায়ের রচিত 'আসরারুত তাওহীদ', হাকীম সানায়ি রচিত 'হাদীকাতুল হাকীকা' ও হযরত খাজা আবদুল্লাহ আনসারী রচিত 'কাশফুল আসরার', 'মোনাজাতে খাজা আবদুল্লাহ আনসারী', হযরত ওসমান বিন আলী হুজবেরির 'কাশফুল মাহজুব', হযরত ফরিদ উদ্দিন আত্তারের 'তাযকেরাতুল আউলিয়া', হযরত জালালুদ্দিন রুমির 'ফীহে মা ফীহে' এবং হযরত শেখ সাদির 'গুলিস্তানে সাদি' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কাব্যগ্রন্থের মধ্যে হযরত বাবা তাহের ওরইয়ান রচিত 'দিওয়ানে শে'রে বাবা তাহের', হযরত ওমর খৈয়্যাম এর 'রুবাইয়াত', হযরত সানায়ি গযনবির 'দিওয়ানে আশআরে সানায়ি', হযরত ফরিদ উদ্দিন আত্তারের 'মানতেকুত তায়ের', হযরত জালালুদ্দিন রুমির 'মসনভিয়ে মা'নাভী' ও 'দীওয়ানে শামস তাবরিযী', হযরত শামসুদ্দিন মোহাম্মদ হাফিযের 'দীওয়ানে হাফিয', হযরত

শেখ সাদির 'বূস্তান' ও 'দীওয়ানে আশআরে সাদি' এবং হযরত আব্দুর রহমান জামির 'দীওয়ানে জামি' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

### ভারত ও বাংলাদেশে সুফিবাদ

সুফিবাদ ব্যাপক অর্থে ইসলামের এলমে মারেফাত বা আল্লাহ তাআলার গভীর গুণবাচক ও প্রেমময় পরিচয় অনুধাবন ও এর শিক্ষার প্রচারের মাধ্যমে গত চৌদ্দশ' বছরের অধিককাল ধরে আটলান্টিক মহাসাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগর এবং মধ্য এশিয়া থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা পর্যন্ত শান্তিময় ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটে। এছাড়া হিজরি দ্বিতীয় শতক বা আটশত খ্রিস্টাব্দ থেকে পৃথিবীর সকল মুসলিম জনপদের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক, এমনকি রাজনৈতিক জীবনেও আধ্যাত্মিক এই দর্শনের প্রভাব ও গ্রহণীয়তা ইতিহাস স্বীকৃত। ইসলামের এই অন্তর্নিহিত ও মানবিক দর্শনের প্রভাব একদিকে যেমন ইসলামের সকল ভাবধারা ও সংস্কৃতিতে পড়েছে। অন্যদিকে শিল্প-সাহিত্য, দর্শন, স্থাপত্য ও সংগীতেও আপন মহিমায় প্রভাবিত হয়েছে। এলমে মা'রেফাতের গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক ও দার্শনিক সাধনা হয়েছে আরবি, ফারসি, তুর্কি ও উর্দু ভাষায়। এক্ষেত্রে খ্রিস্টীয় সতেরো শতক থেকে ইংরেজি ভাষায় ইউরোপীয় চিন্তক, দার্শনিক ও কবি-সাহিত্যিক প্রাচ্যদেশীয় এ আধ্যাত্মিক দর্শন নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেছেন। যদিও এ সংশ্লিষ্ট অ্যারিস্টটলীয় দর্শনের সাথে তাঁদের পরিচয় ছিল অনেক প্রাচীন। কিন্তু এলমে তাসাউফ-এ আত্মশুদ্ধির গভীরতা ও এর সৌন্দর্য-রূপ তাঁদেরকে প্রভাবিত ও ভাবিত করেছে।

**ইসলামের সুফিদর্শনের প্রবর্তক হলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনিই প্রথম ক্বলব বা আত্মার পরিশুদ্ধির কথা বলেছেন। এই শিক্ষা তিনি নিজ জামাতা হযরত আলী (রা.)-কে দিয়েছিলেন। যে কারণে হযরত আলী (রা.)-কে সুফিবাদের শেকড় বলা হয়ে থাকে।**

পবিত্র ইসলামের আবির্ভাবকালে যদিও ইরান ও পরবর্তীকালে যেসব দেশ আরব্য জনপদ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে সেসব দেশে আরব সেনাপতিদের মাধ্যমে বিজয় অর্জিত হয়েছে, কিন্তু পরবর্তীকালে পর্যায়ক্রমে পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চলে সেনাপতি নয়, বরং এলমে তাসাওউফ ও এলমে মা'রেফাত শিক্ষা, সুফিগণের জীবনাচরণ ও তাঁদের ইবাদতখানা ও খানকাসমূহের মাধ্যমে শান্তির ও মানবিক ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটেছে। এর ধারাবাহিকতায় ভারত উপমহাদেশ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, পশ্চিম চীন, তুর্কি জাতিসমূহ, পূর্ব ইউরোপ ও পুরো আফ্রিকা মহাদেশে এই পথ ও পদ্ধতিতে ইসলাম প্রচার ও এর গ্রহণযোগ্যতার বিস্তার ঘটে। বর্তমানকালেও পশ্চিমা জগতে বিশেষ করে সেখানকার শিক্ষিত সমাজে সুফি দর্শনের প্রভাবে একদিকে যেমন ইসলাম সম্পর্কে ইতিবাচক সাড়া জেগেছে অন্যদিকে মুসলিম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশে সুফিবাদের চর্চা ও এর বিস্তার নিয়ে আলোচনা করার প্রেক্ষাপটে একটি বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, প্রসঙ্গটি বর্তমান বাংলাদেশ এবং গত চুয়ান্ন বছরের স্বাধীন বাংলাদেশের তাসাওউফ চর্চার গতি প্রকৃতি ও এর প্রভাব ও বিস্তৃতি বিষয়কে অবলম্বন করলে ঐতিহাসিকভাবে বিষয়ের প্রতি সুবিচার করা হবে না। কেননা, পূর্বেই বলেছি যে, ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবকালে সুফি ধারার উৎপত্তি ঘটেছে। বঙ্গে সুফি ধারণাটিও নতুন রূপে আবির্ভূত হয়নি। আমরা যখন বঙ্গে শব্দ বলছি তখন ভারত উপমহাদেশের তৎকালীন একটি বাংলা ভাষাভাষী বিশাল অঞ্চলকে বুঝি। বিশেষ করে বর্তমান বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম নিয়ে ছিল এর অবস্থান। তাই সুফিবাদের ধারাটি বঙ্গে আসার পূর্বে আরব, পারস্য, বুখারা ও সমরকন্দে এ ভাবধারার পুষ্টি সাধিত হয় (হক, ২০০৬:১৯)। এরপর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিস্তার লাভ করে। অনেকেই মনে করেন, ভারতে ইসলামের এই সুফি ধারাটি অষ্টম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত উদ্ভব ও বিকাশ লাভ করে। ইতিহাসের সুদীর্ঘকালের পরম্পরায় পারস্যের প্রভাব ভারতীয় উপমহাদেশে বিদ্যমান ছিল। তুর্কি-আফগান ও মোগল আমলে ভারতের সকল অঞ্চলের ন্যায় বঙ্গীয় অঞ্চলে এর প্রভাব শক্তিশালী রূপ লাভ করে।

তাই বাংলাদেশে সুফিবাদ চর্চা ও এর বিস্তার পুরো ভারত উপমহাদেশের মতোই। ইতিহাসবিদগণের মতে ভারত হলো সুফিবাদের পাঁচটি প্রধান কেন্দ্রের একটি। বাকি চারটি হলো পারস্য বা ইরান, এখানে মধ্য এশিয়াও অন্তর্ভুক্ত, বাগদাদ, সিরিয়া ও উত্তর আফ্রিকা। বাংলাদেশে সুফিগণের ব্যাপক প্রভাব ছিল। ওলি-আউলিয়া ও পীর বুজুর্গগণের প্রভাবে দক্ষিণ এশিয়া বিশেষ করে আজকের বাংলাদেশের মানুষের পূর্বপুরুষগণ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। একারণেই বাংলাদেশের প্রায় সকল মানুষ কোনো না কোনোভাবে প্রমালয়ের মহান দর্শন সুফিজম দ্বারা প্রভাবিত।

তথ্যসূত্র

১. পবিত্র কুরআনুল কারীম
২. হাদিস শরীফ, আল-বুখারী, ইমাম ইসমাইল বুখারী
৩. কানযুল উম্মাল, ইমাম আলাউদ্দিন আলী মুত্তাকী
৪. কা'রনা'মেয়ে ইসলাম, আবুল হাসান যাররীন কূব
৫. দিওয়ানে খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী, জেহাদুল ইসলাম
৬. ইসলাম ও ইরানের পারস্পরিক সম্পর্ক, শহীদ মোরতাযা মোতাহহারি।

লেখক : অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

# নজরুলের কাব্যচেতনায় হাফিজের প্রভাব

ড. আবদুস সবুর খান

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)-এর প্রথম রচিত গল্প 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' প্রথম প্রকাশিত হয় মাসিক 'সওগাত' পত্রিকায় ১৩২৬ বঙ্গাব্দর (১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দ) জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়। তাঁর রচিত প্রথম কবিতা 'মুক্তি' প্রথম প্রকাশিত হয় 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'র শ্রাবণ সংখ্যায় ১৩২৬ বঙ্গাব্দে। অর্থাৎ ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে। তবে তারও আগে, ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে মহাকবি ফেরদৌসি, রুবাইয়াত খ্যাত ওমর খৈয়াম, প্রেম ও প্রজ্ঞার কবি

জালাল উদ্দিন রুমি এবং সর্বকালের শ্রেষ্ঠ গজল রচয়িতা শামসুদ্দিন মোহাম্মদ হাফিজ প্রমুখের ন্যায় বিশ্ববিশ্রুত পারস্য কবির ফারসি কাব্যের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে করাচির বাঙালি পল্টনে। যে কথা নজরুল তাঁর রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ-এর মুখবন্ধে লিখছেন:

"আমি তখন স্কুল পালিয়ে যুদ্ধে গেছি। সে আজ ইংরিজি ১৯১৭ সালের কথা। সেইখানেই আমার প্রথম হাফিজের সাথে পরিচয় হয়। আমাদের বাঙালী পল্টনে একজন পাঞ্জাবি মৌলভী সাহেব থাকতেন। তাঁর কাছে ক্রমেই আমি ফার্সি কবিদের প্রায় সমস্ত কাব্যই পড়ে ফেলি।"

শুধু তাই-ই নয়, তখন থেকে নজরুল হাফিজের গজলের প্রেমে পড়ে যান। যার ফলে হাফিজের দিওয়ান বা কাব্য সংকলন হয়ে ওঠে তাঁর নিত্যসঙ্গী, তাঁর কাব্যচেতনার অনুপ্রেরণা। এ কারণেই নজরুল যখন করাচির বাঙালি পল্টন থেকে কোলকাতায় ফিরে আসেন তখন তাঁর অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সাথে যত্ন করে বয়ে আনা দিওয়ান-ই-হাফিজ এর একটি কপিও সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। যে ঘটনার বর্ণনা তাঁরবন্ধু কমরেড মুজফফর আহমদ (১৮৮৯–১৯৭৩) কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথায় নজরুলের করাচি থেকে কোলকাতায় ফেরার পরের বর্ণনায় লিখছেন: 'কৌতূহলের বশে আমরা তার গাঁটরি বোঁচকাগুলি খুলে দেখলাম।... কবিতার খাতা, গল্পের খাতা, পুঁথি-পুস্তক, মাসিক পত্রিকা এবং রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি, ইত্যাদিও ছিল। পুস্তকগুলির মধ্যে ছিল ইরানের মহাকবি হাফিজের দিওয়ানের একখানা খুব বড় সংস্করণ। তাতে মূল ৭টি গজলের প্রতি ছত্রের নিচে উর্দু তরজমা দেওয়া ছিল।'

অবশ্য কাজী নজরুল ইসলাম করাচি যাবার আগেই, শৈশবেই পারস্য ভাষা-সাহিত্য ও ইরানি কবিদের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। তাঁর পারিবারিক পরিমণ্ডলে যেমন আরবি-ফারসি ভাষার চর্চা ছিল, একই সাথে ১২০৪ থেকে ১৮৩৭ পর্যন্ত ভারতবর্ষে ফারসি রাজ-ভাষা তথা প্রশাসনের ভাষা হিসেবে প্রচলিত থাকার কারণে ফারসি সাহিত্যের খ্যাতিমান সব কবিই এতদঞ্চলে খুবই পরিচিত ও জনপ্রিয় ছিলেন। মহাকবি হাফিজ তাঁর জীবৎকালেই এতদঞ্চলে খুবই প্রিয় এবং পরিচিত ছিলেন। বাংলার সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ্ (শাসনকাল ১৩৯০–১৪১১) হাফিজকে বাংলায় আমন্ত্রণও জানিয়েছিলেন এবং তাঁর একটি ফারসি গজল, যেটি তিনি সমাপ্ত করতে পারছিলেন না, সম্পূর্ণ করে দেবার জন্য পত্র মারফত হাফিজকে অনুরোধও জানিয়েছিলেন। হাফিজ বাংলায় আসার জন্য মনস্থও করেছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে ঝড়ঝঞ্ঝার শিকার হবার কারণে যাত্রা বাতিল করেন। তবে হাফিজ সুলতানের সেই অসম্পূর্ণ গজলটি সম্পূর্ণ করে পাঠান। পরবর্তীকালে যেটি তাঁর কাব্য সংকলন দিওয়ান-ই-হাফিজ এ সন্নিবেশিত হয়েছে। সে কাহিনী নজরুল কৈশোরে, বাঙালি পল্টনে যোগ দেবার আগেই, শুনেছিলেন। নজরুল তাঁর 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' গ্রন্থের সমাপ্তিতে 'বুলবুল্-ই-শিরাজ মরমী কবি হাফিজের সংক্ষিপ্ত জীবনী'তে এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিতও করেছেন এবং সেই বিখ্যাত গজলটি

পরবর্তীকালে নজরুল বাংলায় অনুবাদও করেছিলেন। যার দুটি বেইত (শ্লোক) তিনি এই জীবনীতে উল্লেখও করেছেন:

'আজকে পাঠাই বাঙলায় যে ইরানের এই ইক্ষু-শাখা এতেই হবে
ভারতের সব তোতার চঞ্চু মিষ্টিমাখা।
দেখ গো আজ কল্পলোকের কাব্যদূতীর অসম সাহস,
এক বছরের পথ যাবে যে, একটি নিশি যাহার বয়স।'

নজরুল যে পারস্য কবিদের মধ্যে হাফিজ কর্তৃকই সবচেয়ে অধিক প্রভাবিত ছিলেন এ কথা কবি আবদুল মান্নান সৈয়দও বলেছেন। প্রখ্যাত কবি ও প্রাবন্ধিক আবদুল মান্নান সৈয়দ তাঁর "নজরুল-অনূদিত 'দীওয়ান-ই- হাফিজ'-এর অগ্রন্থিত একাংশ" প্রবন্ধে বলেন: 'কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) সর্বাধিক উদ্বুদ্ধ অনুপ্রেরিত-আলোড়িত হয়েছিলেন ফারসি কবিদের দ্বারা। তিনজন ফারসি কবির কবিতা নজরুল অনুবাদ করেন : ওমর খৈয়াম (-১১২৩), জালালউদ্দীন রুমি (১২০৭-৭৩) এবং শামসুদ্দীন মুহম্মদ হাফিজের (১৩২৫-৮৯)। এঁদের মধ্যেও আবার নজরুল সর্বাধিক উজ্জীবিত ছিলেন হাফিজ-এর কবিতায়।'

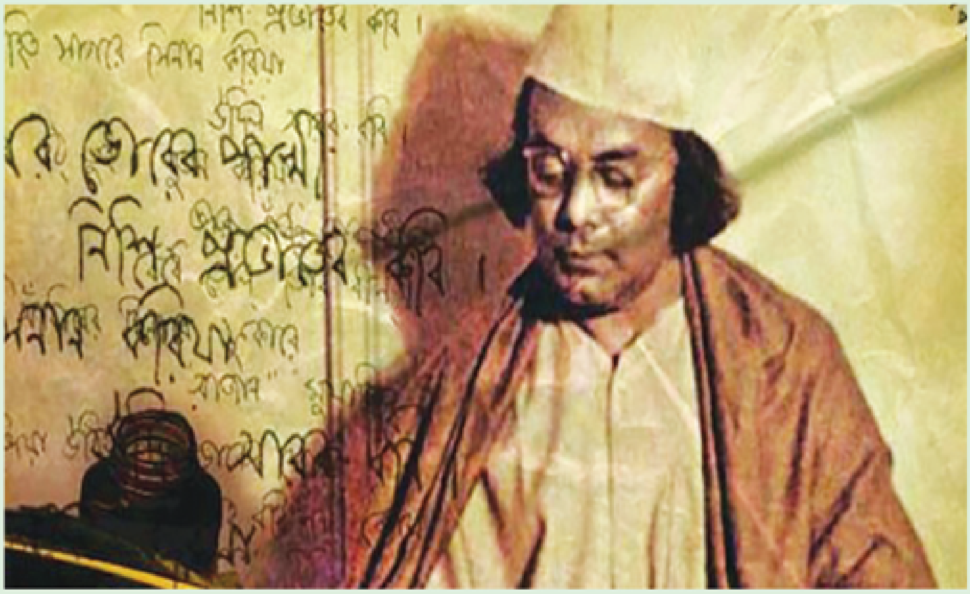

তাই একথা নিঃসংশয়েই বলা যায় যে, নজরুলের কাব্যমানস গড়েই উঠেছিল হাফিজের কাব্য-প্রভাবে। হাফিজের গজল-রুবায়ি পড়েই নজরুলের কাব্যমানসের জন্ম হয়েছিল। হাফিজের কবিতা পড়ে নজরুল এতটাই প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন যে, কবিতা লিখবার সাহস করার আগেই তিনি হাফিজের দিওয়ান অনুবাদে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। যে কথা তিনি রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ ভূমিকাতে অকপটেই স্বীকার করেছেন :

'তখন থেকেই আমার হাফিজের 'দীওয়ান' অনুবাদের ইচ্ছা হয়। কিন্তু তখনো কবিতা লিখবার মত যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারিনি। এর বৎসর কয়েক পরে হাফিজের দীওয়ান অনুবাদ করতে আরম্ভ করি। অবশ্য তাঁর রুবাইয়াৎ নয়–গজল। বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় তা প্রকাশিতও হয়েছিল। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি গজল অনুবাদের পর আর আমার ধৈর্যে কুলোল না, এবং ঐখানেই ওর ইতি হয়ে গেল।

তারপর এস, সি, চক্রবর্তী এন্ড সঙ্গের স্বত্বাধিকারী মহাসয়ের জোর তাগিদে এর অনুবাদ শেষ করি।

যেদিন অনুবাদ শেষ হলো সেদিন আমার খোকা বুলবুল চলে গেছে।

আমার জীবনে যে ছিল প্রিয়তম, যা ছিল শ্রেয়তম তারই নজরানা দিয়ে শিরাজের বুলবুল কবিকে বাঙলায় আমন্ত্রণ করে আনলাম।

বাংলার শাসনকর্তা গিয়াসুদ্দিনের আমন্ত্রণকে ইরানের কবি-সম্রাট হাফিজ উপেক্ষা করেছিলেন। আমার আহ্বান উপেক্ষিত হয়নি। যে পথ দিয়ে আমার পুত্রের 'জানাজা' (শব যান) চলে গেল, সেই পথ দিয়ে আমার বন্ধু, আমার প্রিয়তম ইরানী কবি আমার দ্বারে এলেন। আমার চোখের জলে তার চরণ অভিষিক্ত হল...।'

মহাকবি হাফিজের মূল নাম ছিল শামসুদ্দিন মোহাম্মদ। হাফিজ ছিল তাঁর তাখাল্লুস বা ভনিতা। তবে ইরানিরা তাঁকে আদর করে 'বুলবুল-ই-শিরাজ' বা 'শিরাজের বুলবুলি' বলে ডাকে। নজরুল হাফিজ কর্তৃক এতটাই প্রভাবিত ছিলেন যে, তিনি তাঁর পুত্রের নাম রাখেন 'বুলবুল'। যে পুত্র শৈশবেই কবি-বাবার কোল শূন্য করে পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়। নজরুল তাঁর 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' গ্রন্থটি শিশুপুত্র বুলবুলকে উৎসর্গ করে উৎসর্গ পত্রে লিখেন:

'বাবা বুলবুল।

তোমার মৃত্যু-শিয়রে ব'সে "বুলবুল-ই-শিরাজ" হাফিজের রুবাইয়াতের অনুবাদ আরম্ভ করি। যেদিন অনুবাদ শেষ ক'রে উঠলাম,
সেদিন তুমি–আমার কাননের বুলবুলি–উড়ে গেছ! যে দেশে গেছ তুমি, সে কি বুলবুলিস্তান ইরানের চেয়েও সুন্দর?
জানি না তুমি কোথায়! যে লোকেই থাক, তোমার শোক-সন্তপ্ত পিতার এই শেষ দান চুম্বন ব'লে গ্রহণ ক'রো।
তোমার চার বছরের কচি গলায় যে সুর শিখে গেলে, তা ইরানের বুলবুলিকেও বিস্ময়ান্বিত ক'রে তুলবে।
শিরাজের-বুলবুল-কবি হাফিজের কথাতেই তোমাকে স্মরণ করি–

"সোনার তাবিজ রূপার সেলেট
মানাত না বুকে রে যার,
পাথর চাপা দিল বিধি
হায়, কবরের শিয়রে তার।'

হাফিজ এবং নজরুলের জীবনেও বিস্ময়রকর রকমের সাজুয্য ছিল। হাফিজ ও নজরুল উভয়েই শিশুকালেই পিতৃহারা হন। হাফিজের পিতা বাহাউদ্দিন ইরানের ইস্পাহান থেকে ব্যবসায় উদ্দেশ্যে শিরাজ নগরিতে এসে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন। ব্যবসায় বেশ সমৃদ্ধিও আসে তাঁর। কিন্তু তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে সমস্ত ব্যবসা এমন গোলমেলে হয়ে যায় যে, শিশু হাফিজ ও তাঁর মা ঐশ্বর্যের কোল থেকে একেবারে দারিদ্র্যের করাল গ্রাসে পতিত হন। বাধ্য হয়েই তখন হাফিজকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জন করতে হয়। এমনকি জীবিকা নির্বাহের জন্য হাফিজ শৈশবে রুটির দোকানেও কাজ করেন। তবে কোনো কোনো জীবনীকার বলেন দারিদ্র্যের কারণে হাফিজকে তাঁর মা একজন সঙ্গতিসম্পন্ন বণিকের নিকট সমর্পণ করেন। সেখানে থেকেই হাফিজ পড়াশুনা করার অবকাশ পান। অন্যান্য জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি তিনি পবিত্র কুরআন শরীফ সম্পূর্ণ মুখস্ত করেন। সে কারণেই তিনি 'হাফিজ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

কাজী নজরুল ইসলামও শৈশবেই পিতৃহারা হন। স্বীয় জন্মস্থান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোলের চুরুলিয়া গ্রামের এক মক্তবে কোরআন, ইসলাম ধর্ম, দর্শন এবং ইসলামি ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন শুরু করেন। ১৯০৮ সালে মাত্র ৯ বছর বয়সে পিতার মৃত্যুর পর পারিবারিক অভাব-অনটনের কারণে নজরুলের শিক্ষাজীবন বাধাগ্রস্ত হয়। মাত্র ১০ বছর বয়সে তাঁকে নামতে হয় জীবিকা অর্জনে। স্থানীয় মসজিদে মুয়াজ্জিন হিসেবে কাজও করেছিলেন। কৈশোরে লেটোর দলের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে কবিতা, নাটক ও সাহিত্য সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করেন। এ সময় তিনি নিজেও দলের জন্য কিছু গান বাঁধেন, যদিও এগুলো তাঁর কোনো রচনাবলিতে স্থান পায়নি। ১৯১০ সালে নজরুল লেটো দল ছেড়ে ছাত্রজীবনে ফিরে আসেন। কিছুদিন আসানসোল রুটির দোকানে কাজ করেন। এভাবে বেশ কষ্টের মাঝেই তাঁর বাল্যজীবন অতিবাহিত হতে থাকে। এই দোকানে কাজ করার সময় আসানসোলের দারোগা রফিজউল্লাহর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তিনিই নজরুলকে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহের ত্রিশালের দরিরামপুর স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি করিয়ে দেন। ১৯১৫ সালে তিনি আবার রানীগঞ্জের সিয়ারসোল রাজ স্কুলে ফিরে যান এবং সেখানে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হন। ১৯১৭ সাল পর্যন্ত এখানেই পড়াশোনা করেন। এ বছরের শেষ দিকে মাধ্যমিক পরীক্ষা না দিয়ে তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীতে সৈনিক হিসেবে যোগ দেন।

হাফিজও তাঁর পাঠ্যাবস্থাতেই কৈশোরেই স্বভাবদত্ত শক্তিবলে কবিতা রচনা করতে শুরু করেন, কিন্তু সেসব রচনা তেমন সমাদর লাভ করতে পারেনি। তবে কিছুদিন পর 'বাবা কুহি' নামক শিরাজের উত্তরে পর্বতোপরিস্থ এ দরগায় ইমাম আলি নামক এক দরবেশের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। সেদিন বাবা কুহিতে সারারাত ধরে ধর্মীয় উৎসব চলছিল। হাফিজও সেই উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। এই উৎসবেই ইমাম আলি হাফিজকে রহস্যময় কিছু একটা স্বর্গীয় খাবার খেতে দেন। বলেন, এর পরই হাফিজ কাব্যলক্ষ্মীর সহস্রপুরীর সব ঐশ্বর্যের অধিকারী হবেন। হয়ও তাই। এর পর থেকেই চারদিকে হাফিজের কাব্যখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং তাঁর কবিতার বিপুল সংখ্যক ভক্ত-অনুরাগী তৈরি হয়।

তবে সমকালে হাফিজের কবিতার নিন্দুকেরও অভাব ছিল না। হাফিজের সমকালে শিরাজের শাসনকর্তা ছিলেন শাহ্ আবু ইসহাক ইঞ্জা। তিনি নিজেও একজন কবি ও সমঝদার ছিলেন। তিনি হাফিজের অন্যতম ভক্ত ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিছুদিন পর শাহ্ সুজা শিরাজের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। কিরমানি নামক এক কবির অতিশয় ভক্ত ছিলেন শাহ্ সুজা। তাই তিনি হাফিজকে বড় কবি বলে স্বীকার করতেন না। শাহ্ সুজা নিজেও ছিলেন কবি। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি হাফিজের সমকক্ষ ছিলেন না বলেই তিনি ইমাদকে বড় কবি বলে হাফিজকে হেয় করার প্রয়াস চালান। একবার শাহ্ সুজা হাফিজের কবিতার নিন্দাবাদ করায় হাফিজ তার উত্তরে বলেন, 'তবুও আমার এই কবিতা সারা দেশের লোকে কণ্ঠস্থ করে, প্রশংসা করে, আবৃত্তি করে। কিন্তু এই নগরে এমন অনেক কবি আছে, যাদের কবিতা এই শহরের সীমা অতিক্রম করতে পারে না।'

এই উত্তর শুনে শাহ্ সুজার বুঝতে বাকি রইল না যে, এটি তাঁকেই উল্লেখ করে বলা হয়েছে। কিন্তু তিনি যতই ক্রোধান্বিত হন, কিছু করতেও পারলেন না। এর অল্প ক'দিন পরই হাফিজের দুই লাইন কবিতা তাঁর হাতে এসে পড়ে :

گر مسلمانی از این است که حافظ دارد
آه اگر از پی امروز بود فردایی

'হাফিজের কাছে যা আছে তাই যদি হয় মুসলমানি

হায়, তাহলে কবেই আজ শেষ হয়ে আসত আগামী'

এই কবিতার সুবিধা নিয়ে শাহ্ সুজা মনস্থ করেন, হাফিজের বিধর্মী বলে বিচার হবে। এই সংবাদ পেয়ে হাফিজ অতিশয় সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। সেই সময় সৌভাগ্যক্রমে শিরাজে মৌলানা জায়নুদ্দিন আবু বকর তায়াবাদি উপস্থিত ছিলেন। হাফিজ গিয়ে তাঁর পরামর্শ চাইলেন। তিনি হাফিজকে এর সাথে আরও এমন দুই লাইন কবিতা জুড়ে দিতে বললেন, যার দ্বারা পূর্বের দুই লাইন কবিতার অর্থ একেবারে পাল্টে যায়।

সেই অনুযায়ী হাফিজ উক্ত কবিতার সাথে আরও দুই লাইন যুক্ত করলেন:

این حدیثم چه خوش آمد که سحرگه می‌گفت
بر در میکده‌ای با دف و نی ترسایی
گر مسلمانی از این است که حافظ دارد
آه اگر از پی امروز بود فردایی

'এই কথাটা আমার কতই ভাল লাগছিল
প্রত্যুষে কেউ শারাবখানার দ্বারে দফ-বাঁশি সমেত গাইছিল
হাফিজের কাছে যা আছে তাই যদি হয় মুসলমানি
হায়, তাহলে কবেই আজ শেষ হয়ে আসত আগামী'

এবং বললেন, পরিপূর্ণ কবিতাটা হচ্ছে এরূপ। ফলে বিচারে তিনি মুক্তি পান।

হাফিজের মৃত্যুর পরও নিন্দুকদের একদল তার জানাজা পড়তে ও কবর দিতে অসম্মত হয়। হাফিজের ভক্তদের সাথে এটি নিয়ে

বিসম্বাদের সৃষ্টি হলে কয়েকজনের মধ্যস্থতায় উভয় দলের মধ্যে এই শর্তে রফা হয় যে, হাফিজের সমস্ত কবিতা একত্র করে একজন তার যে কোনো স্থান খুলে দেবে; সেই পৃষ্ঠার প্রথম দুই লাইন কবিতা পড়ে হাফিজের ধর্ম কী ছিল তা ধরে নেওয়া হবে। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, যে দুটি লাইন পাওয়া গেল তা হচ্ছে:

قدم دریغ مدار از جنازه حافظ
که گرچه غرقِ گناه است می‌رود به بهشت

হাফিজের এই শব হতে গো তুলো না কো চরণ প্রভু
যদিও সে মগ্ন পাপে বেহেশতে সে যাবে তবু।

এই ঘটনার পর সবাই বিনা বাক্যে হাফিজের জানাজায় অংশগ্রহণ করে।

সমকালে নজরুলও আকাশস্পর্শী জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন। হাফিজের মতো সমকালে তাঁর কবিতা ও গানেরও অসংখ্য ভক্ত-অনুরাগী তৈরি হয়। শ্যামা সংগীত, হামদ-নাত, মুসলিম ধর্মীয় উৎসব, রমজান, ঈদ, নামাজ, বিপ্লব, প্রেম-দ্রোহ সর্বত্রই নজরুল সমান নন্দিত হতে থাকেন। এই বিপুল জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে খোদ কোলকাতার একদল লেখক তাঁর শত্রুতায় নেমে গিয়েছিলেন। এ সাহিত্য-চক্রটি গড়ে উঠেছিল প্রধানত অশোক চট্টোপাধ্যায়কে কেন্দ্র করে। তিনিই কয়েকজন তরুণকে নিয়ে সর্বপ্রথম সাপ্তাহিক রূপে 'শনিবারের চিঠি' শীর্ষক একটি সাময়িকী প্রকাশ করেন। 'শনিবারের চিঠি' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ১০ শ্রাবণ (অর্থাৎ ২৬ জুলাই ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ) থেকে সাপ্তাহিক রূপে। পরে এটি মাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। মূলত এই পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করেই কোলকাতায় একটি সাহিত্য-চক্র গড়ে উঠেছিল তৎকালীন সময়ে। বলা বাহুল্য, কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন এ পত্রিকার প্রধান লক্ষ্যবস্তু। নজরুল-বিরোধিতার সর্বাত্মক অভিযানের উদ্যোগ নিয়েছিলেন 'প্রবাসী' কর্তৃপক্ষ পুষ্ট 'শনিবারের চিঠি'। ১৯২৪ সাল থেকে সে বিরোধিতার সূত্রপাত এবং কয়েক বছরব্যাপী তা অব্যাহত থাকে। অশোক চট্টোপাধ্যায় এই অভিযানের নেতৃত্ব দেন। এ ছাড়া নীরদ চন্দ্র চৌধুরী, সজনী কান্ত দাস এং মোহিত লাল মজুমদার প্রমুখ 'শনিবারের চিঠি'র বড় পাণ্ডা সেজেছিলেন নজরুলকে ঘায়েল করবার জন্য।

**সমকালে নজরুলও আকাশস্পর্শী জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন। হাফিজের মতো সমকালে তাঁর কবিতা ও গানেরও অসংখ্য ভক্ত-অনুরাগী তৈরি হয়। শ্যামা সংগীত, হামদ-নাত, মুসলিম ধর্মীয় উৎসব, রমজান, ঈদ, নামাজ, বিপ্লব, প্রেম-দ্রোহ সর্বত্রই নজরুল সমান নন্দিত হতে থাকেন।**

নজরুলের বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী', যেটি তিনি চিরকুট টুকরো কাগজে পেন্সিলে লিখেছিলেন, প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ৬ই জানুয়ারি শুক্রবার 'সাপ্তাহিক বিজলি' পত্রিকায়। এটি এতটাই পাঠকপ্রিয়তা পায় যে, খুব অল্প সময়েই 'বিজলি' পত্রিকার সব কপি ফুরিয়ে যায়। ফলে 'বিজলি'র পরবর্তী সংখ্যায়ও 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশিত হয়। সারা ভারত বর্ষে আলোড়ন সৃষ্টি করে নজরুলের 'বিদ্রোহী'। দ্রুত খ্যাতি ছড়ায় 'বিদ্রোহী' কবিতার স্রষ্টা তরুণ কবি কাজী নজরুল ইসলামের। নজরুলের এই খ্যাতিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে কবি নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতাকে ব্যঙ্গ করে বেনামে সজনী কান্ত দাস 'ব্যাঙ' শিরোনামে ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ১৮ আশ্বিন সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে অশ্লীল প্যারোডি প্রকাশ করেন।

'শনিবারের চিঠি'তে 'বিদ্রোহী' কবিতার এই প্যারোডি প্রকাশিত হলে তরুণ কবি-সাহিত্যিকরা মনে করে এটি মোহিত লাল মজুমদারেরই রচনা। এর ফলে কাজী নজরুল ইসলাম মোহিত লালকে লক্ষ্য করে ১৩৩১ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যা 'কল্লোল'-এ 'সাবধানী ঘন্টা' শিরোনামে লিখেছিলেন:

'রক্তে আমার লেগেছে আবার সর্বনাশের নেশা।
রুধির- নদীর পার হতে ঐ ডাকে বিপ্লব হ্রেষা।
হে দ্রোনাচার্য, আজি এই নব জয় যাত্রার আগে,
দ্বেষ পঙ্কিল হিয়া হতে তব শ্বেত পঙ্কজ মাগে।
শিষ্য তোমার দাও গুরু দাও তব রূপ-মসি খানি,
অঞ্জলি ভরি শুধু কুৎসিত কদর্যতার গ্লানি।
তোমার নীচতা, ভীরুতা তোমার, তোমার মনের কালি
উদগার গুরু শিষ্যের শিরে; তব বুক হোক খালি।'

বলা বাহুল্য, মোহিত লাল এই কবিতাটি পড়ে ভীষণ ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং এর প্রতি-উত্তরে 'দ্রোন-গুরু' শিরোনামে অত্যন্ত কদর্য ভাষায় একটি কবিতা রচনা করে ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ৮ কার্তিক সংখ্যায় 'শনিবারের চিঠি'তে তিনি তা প্রকাশ করেন:

'আমি ব্রাহ্মণ, দিব্য চক্ষে দুর্গতি হেরি তোর,
অধঃপাতের দেরী নাই আর ওরে হীন জাতি চোর।
আমার গায়ে যে কুৎসার কালি ছড়াইলি দুই-হাতে,
সব মিথ্যার শাস্তি হবে সে এক অভিসম্পাতে।
গুরু ভার্গব দিল যা তুহারে! ওরে মিথ্যার রাজা!
আত্ম পূজার ভণ্ড পূজারী! যাত্রার বীর সাজা
ঘুচিবে তোমার- মহাবীর হওয়া মর্কট সভাতলে!
দু'দিনের এই মুখোশ-মহিমা তিতিবে অশ্রু জলে!
অভিশাপ রূপী নিয়তি করিবে নিদারুণ পরিহাস-
চরম ক্ষণে মেদিনী করিবে রথের চক্র গ্রাস।'

অপরদিকে নজরুলের স্বধর্মের একশ্রেণির ধর্মান্ধগোষ্ঠীও তাঁর বিরুদ্ধে কঠিন ও কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। নজরুল বরাবরই হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মের যা কিছু মহান ও মানুষের জন্য কল্যাণকর এবং সর্বোপরি দেশ ও জাতির মুক্তির প্রেরণার জন্য ব্যবহার্য সবকিছুই তাঁর গান-কবিতা-গল্পে ব্যবহার করেন পক্ষপাতহীনভাবে। ভারতীয় ঐতিহ্যের এই সাবলীল ব্যবহারকে

‘কোফরী কালাম’ বলে মন্তব্য করেছিলেন ‘ইসলাম দর্শন’ পত্রিকার সম্পাদক। এ পত্রিকায় (কার্তিক, ১৩২৯ সংখ্যায়) মুনশী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ নামের একজন ‘লোকটা মুসলমান না শয়তান’ এই শিরোনামে লিখেছিলেন, ‘নজরুল যথেষ্ট শক্তিশালী কবি হলেও মুসলমানদের গৌরব করার কিছুই নেই।’ কারণ, ‘হিন্দুয়ানী মাদ্দায় ইহার মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ।’

এসব কিছুর জবাবে নজরুল বলেছেন :

‘উহারা প্রচার করুক হিংসা বিদ্বেষ আর নিন্দাবাদ;
আমরা বলিব সাম্য শান্তি এক আল্লাহ জিন্দাবাদ।
উহারা চাহুক সংকীর্ণতা, পায়রার খোপ, ডোবার ক্লেদ,
আমরা চাহিব উদার আকাশ, নিত্য আলোক, প্রেম অভেদ।
উহারা চাহুক দাসের জীবন, আমরা শহীদি দরজা চাই;
নিত্য মৃত্যু-ভীত ওরা, মোরা মৃত্যু কোথায় খুঁজে বেড়াই!’

হাফিজ ছিলেন উদাসীন সুফি। তাঁর নিজের কবিতার প্রতি তাঁর

মহাকবি হাফিজ সিরাজির সমাধি

মমতাও তেমন ছিল না। তাই কবিতা লিখার পরই তাঁর বন্ধুবান্ধব কেউ সংগ্রহ না করে রাখলে তা হারিয়ে যেত। কিন্তু তাঁর কবিতার অধিকাংশই গজল-গান বলে, লেখা হওয়া মাত্রই মুখে মুখে সেগুলো গীত হতো। ধর্মীয় উপাসনালয় থেকে শুরু করে পানশালা এবং গৃহকোণ সর্বত্রই তাঁর গজল গীত হতো। তবে তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর রচিত এসব গজল-রুবাঈর কোনো সংকলন হয়নি। হাফিজের মৃত্যুর পর তাঁর প্রিয় বন্ধু-সহচর গোল আন্দামই প্রথম নানা জনের কাছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা হাফিজের গজল-রুবাঈর সংগ্রহ করে ‘দিওয়ান’ সংকলন করেন। যাতে পাঁচ শতাধিক গজল এবং তেহাত্তরটি রুবাঈ স্থান পায়। এর বাইরে যে হাফিজের আর কোনো গজল-রুবাঈ ছিল না, এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুলও ছিলেন অনেকটা উড়নচণ্ডি স্বভাবের। তাঁর কোনো কিছুই গোছানো ছিল না; এমনকি জীবনটাও। জীবন-জগৎ ও বৈষয়িক স্বার্থ সম্পর্কে নজরুল ছিলেন উদাসীন। তাই তাঁর বহু রচনাই হারিয়ে গেছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় নজরুল যে হাফিজের ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি গজল অনুবাদ করেছিলেন, যে কথা তিনি তাঁর রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ এর ভূমিকাতে উল্লেখও করেছেন। কিন্তু বাস্তবে আমরা তাঁর রচনাবলির বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত আকারে সংকলিত হওয়া মোট সতেরোটি গজলের অনুবাদ পাই। বাকি অর্ধেকেরই কোনো হদিস মেলে না। হাফিজ বাংলার সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের অনুরোধে তাঁর যে গজলটি সম্পূর্ণ করে পাঠিয়েছিলেন নজরুল সেটিও অনুবাদ করেছিলেন। যার প্রমাণ মিলে নজরুলের ‘রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ’ গ্রন্থে নজরুল যে হাফিজের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ করেছেন সেখানে তিনি এই গজলের দুটি বেইত বা চারটি চরণ উদ্ধৃত করেছেন। যেগুলোর অনুবাদ তাঁর নিজের কৃত। এতেই প্রমাণিত হয় নজরুল এই গজলটি সম্পূর্ণ অনুবাদ করেছিলেন। অথচ তাঁর রচনাবলির কোথাও এই বিখ্যাত গজলটির সম্পূর্ণ অনুবাদ সংকলিত হয়নি। গ্রামোফোন কোম্পানিতে যখন নজরুলের গান রেকর্ডিং হয়ে বাজারে প্রচুর বিক্রি হচ্ছিল তখন অনেক অসৎ গীতিকার অর্থ-লোভে নজরুলের গান নিজেদের নামে চালিয়ে দিচ্ছিলেন। নজরুলের সুহৃদ বন্ধুরা নজরুলের কাছে এসে এ বিষয়ে অনুযোগ করলে নজরুল ভাবলেশহীনভাবে জবাব দিতেন, ‘নিক। সমুদ্র থেকে ঝিনুক দিয়ে ক'ফোটা জলই বা ওরা নেবে!’

নজরুলের ভাষ্যে, ‘হাফিজের গজল অতল গভীর সমুদ্রের মত। কূলের পথিক যেমন তাহার বিশালতা, তরঙ্গলীলা দেখিয়া অবাক হয়, বিস্ময়ে চাহিয়া থাকে, অতল-তলের সন্ধানী ডুবুরী তেমনি তাহার তলদেশে অজস্র মণিমুক্তার সন্ধান পায়। তাহার উপরে যেমন ছন্দ-নর্তন, বিপুল বিশালতা; নিম্নে তেমনি অতল গভীর প্রশান্তি, মহিমা।’

‘হাফিজের রুবাইয়াৎ’-এর বৈশিষ্ট্য মূল্যায়ন করতে গিয়ে নজরুল তাঁর ‘রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ’-এর মুখবন্ধে বলেছেন : ‘সত্যকার হাফিজকে চিনতে হলে তাঁর গজল-গান–প্রায় পঞ্চশতাধিক–পড়তে হয়। তাঁর রুবাইয়াৎ বা চতুষ্পদী কবিতাগুলি পড়ে মনে হয়, এ যেন তাঁর অবসর সময় কাটানোর জন্যই লেখা। অবশ্য এতেও তাঁর সেই দর্শন, সেই প্রেম, সেই শারাব-সাকি তেমনিভাবেই জড়িয়ে আছে!

এ যেন তাঁর অতল সমুদ্রের বুদ্বুদ-কণা। তবে এ ক্ষুদ্র বিম্ব হলেও এতে সারা আকাশের গ্রহ-তারার প্রতিবিম্ব পড়ে একে রামধনুর কণার মত রাঙিয়ে তুলেছে। হয়ত ছোট বলেই এ এত সুন্দর।’

হাফিজকে মূলত আমরা প্রেমের কবি হিসেবেই চিহ্নিত করি। তবে সে প্রেম অধ্যাত্ম প্রেম। সৃষ্টিজগৎ আর স্রষ্টার প্রতি প্রেমই তাঁর উদ্দিষ্ট। স্রষ্টাই তাঁর পরম প্রেমাস্পদ। তাঁর মতে প্রেম-ভালোবাসা এমন এক ঐশী চেতনা, যা মানুষকে তার প্রেমের মূলে তথা প্রেমাস্পদের সান্নিধ্য লাভে উদ্বুদ্ধ করে। পরমাত্মা বা স্রষ্টার আকর্ষণ তার মধ্যে এমনভাবে এক বিশাল আকার ধারণ করে যে, সৃষ্টির যেকোনো সৌন্দর্যই তাকে স্রষ্টার স্মরণে আকুল করে তোলে। হাফিজ এই প্রেমকে এমন এক মূল্যবান অর্ঘ বলে মনে করেন যার প্রাপ্তি কেবল তার প্রেমাস্পদের একান্ত অনুগ্রহেই সম্ভব। আর আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমেই কেবল প্রেমাস্পদের একান্ত অনুগ্রহ লাভ করা যায়। প্রেমের পথে নামলেই সে প্রেমাস্পদের পথ পেয়ে যায়। স্রষ্টার সৃষ্টিকুলকে ভালোবাসার মাধ্যমে পাওয়া যায় পরম স্রষ্টার প্রেমের সন্ধান। বন্ধু-শত্রু নির্বিশেষে সবাইকে ভালোবাসলে, সবার সাথে সদ্ভাব বজায় রাখলেই কেবল দুই ভুবনের প্রশান্তি পাওয়া যায়। তাঁর ভাষায় :

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
با دوستان مروت با دشمنان مدارا

‘দুই ভুবনে প্রশান্তির ব্যাখ্যা এ দুই কথাতেই আছে নিহিত
বন্ধুর সাথে মনুষ্যত্ব আর শত্রুর সাথে কর হিত’

তাই তিনি বন্ধুত্বের বৃক্ষের যত্ন নিতে এবং শত্রুতার চারা গাছ উপড়ে ফেলতে পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ, তাহলেই তোমার মনোবাঞ্ছা অর্থাৎ কাঙ্ক্ষিত প্রশান্তি প্রাপ্তি ঘটবে আর তুমি অযাচিত যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে। তাঁর ভাষায় :

درختِ دوستی بنشان که کام دل به بار آرد
نهالِ دشمنی بَرکَن که رنج بی‌شمار آرد

‘বন্ধুত্বের গাছ লাগাও পূর্ণ করে যা মন-বাসনা
শত্রুতার চারাগাছ উপড়ে ফেল আনে যা অগণন যন্ত্রণা’

অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে হাফিজ মুর্শেদের আবশ্যকতা উপলব্ধি করেছেন। তাঁর মতে, ‘মুর্শেদ ব্যতীত প্রেমের পথে পা বাড়ানো উচিত নয়। কারণ, এই পথে পথপ্রদর্শক বা মুর্শেদ না পেলে পথিককে পথভ্রান্ত হতে হয়।’ তিনি বিশ্বাস করেন, মুর্শেদের প্রতি অবিচল ভক্তি ও মুর্শেদের নির্দেশ দ্বিধাহীন চিত্তে পালন করা অত্যাবশ্যক। কারণ, পথের খবর ও পথচলার রীতি-নীতি একমাত্র মুর্শেদই জানেন। তাই হাফিজ তাঁর কবিতায় বলেছেন:

به می سجّاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید
که سالک بی‌خبر نبُوَد ز راه و رسم منزل‌ها

‘শারাব রঙে রাঙারে তুই মসল্লা তোর হুকুম পেলে
সাচ্চা পীরের; পথিক জানে সরাইখানা কোথা মেলে।’

হাফিজ বসন্তের জয়গান গেয়েছেন, সুরার অসামান্য স্তুতি করেছেন। গোলাপ, যৌবন আর সৌন্দর্যের প্রশস্তি রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তবে এসব চিরন্তন সৌন্দর্যের তারিফের সাথে মিলিয়ে নিয়েছেন রূপ আর আকাঙ্ক্ষার ঐশ্বর্যের কথা। যার ফলে তাঁর কাব্যে শারাব-সাকি-সরাইখানার ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এতে সাধারণ পাঠক, যাঁরা অধ্যাত্মবাদের নিগূঢ় রহস্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন, দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে যান। শুধু হাফিজের কবিতাতেই নয়, ফারসি কাব্যে শারাব-সাকীর যে ব্যাপক ব্যবহার তা মূলত রূপকার্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং এটি আধ্যাত্মিক ধারার ফারসি কাব্যের বিশেষ আভরণ। নজরুল এ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাই তিনি তাঁর ‘রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ’-এর মুখবন্ধে শারাব-সাকীর ব্যাখ্যায় বলেছেন :

‘শারাব বলতে এরা বোঝেন–ঈশ্বরের, ভূমার প্রেম, যা মদিরার মতই মানুষকে উন্মত্ত করে তোলে। সাকি অর্থাৎ যিনি সে শারাব পান করান। যিনি ঐশ্বরিক প্রেমের দিশারী, দেয়াসিনী। পানশালা–সেই ঐশ্বরিক প্রেমের লীলা-নিকেতন।”

মূলত হাফিজের কবিতায় অনুপ্রাণিত হয়েই নজরুলও তাঁর কবিতায় প্রেম-দ্রোহ, দেশাত্মবোধ, সম্প্রীতি আর মানবতার

জয়গান গেয়েছেন। জাতি-ধর্মের পারস্পরিক সম্প্রীতি ছিল নজরুল-ভাবনার এক অনবদ্য আলোকশিখা। তাঁর আদর্শ ছিল এমন এক সমাজ, যেখানে হিন্দু-মুসলমান বিভেদ থাকবে না। শ্রেণিবিভাজনের উর্ধ্বে সকলের পরিচয় হবে অভিন্ন। ‘মানুষ’ হিসেবে পরিচিত হবে সবাই। নজরুল বিশ্বাস করতেন, সকল ধর্মের মূল বাণী হলো মানুষ ও মানবতা। বিভেদ আর শ্রেণিবিভাজন করেছে মানুষ; নিজেদের লাভের প্রত্যাশায়। তাই সমাজের কোলাহল থেকে সরে দাঁড়িয়ে হৃদয়ের আকুলতাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন তিনি দারুণ আগ্রহ ও সাহসের সাথে। মানুষের জয়গান গেয়েছেন দেশ-কাল-পাত্রের ভেদাভেদকে ছাড়িয়ে। তাঁর দৃঢ় কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে :

‘গাহি সাম্যের গান
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই নহে কিছু মহিয়ান।

নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি,
সব দেশে, সব কালে, ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি যেখানে
আসিয়া এক হয়ে গেছে সব ব্যবধান,
যেখানে মিশেছে হিন্দু বৌদ্ধ মুসলিম খ্রীস্টান।'

সাম্প্রদায়িক বিবাদ প্রসঙ্গে নজরুল ছিলেন নিরপেক্ষ। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠাই ছিল নজরুলের মূল আরাধ্য। হিন্দু-মুসলিমের 'গালাগালি'কে তিনি 'গলাগলি'তে পরিণত করার প্রয়াশ চালিয়েছেন আজীবন। প্রসঙ্গত, ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে জাতীয় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে দেয়া তাঁর ভাষণের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যায়। যেখানে নজরুল বলেছেন : 'কেউ বলেন আমার বাণী যবন, কেউ বলেন কাফের। আমি বলি ও দুটো কিছুই নয়। আমি মাত্র, হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে এনে হ্যান্ডশেক করাবার চেষ্টা করেছি। গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি।'

কিন্তু কুসংস্কার আর সঙ্কীর্ণ মানসিকতায় আচ্ছন্ন উগ্রপন্থী সাম্প্রদায়িকরা (হিন্দু-মুসলিম উভয় পক্ষই) তাঁকে তাঁর সৃষ্টির পথে বার বার বাধা সৃষ্টি করেছে। হাফিজের মতো তাঁকেও 'ধর্মত্যাগী', 'কাফের', এসব নিন্দাবাদের মুখোমুখি হতে হয়েছে। তবে দৃঢ়চেতা কবি নজরুল তখনও থেকেছেন আপোসহীন, প্রবল প্রতিবাদী। এসব অভিযোগ নজরুল তাঁর কবিতায় এভাবেই উল্লেখ করেছেন :

'গুরু ক'ন, তুই করেছিস শুরু তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁছা!

প্রতি শনিবারী চিঠিতে প্রেয়সী গালি দেন, 'তুমি হাঁড়িচাঁচা!'
আমি বলি, 'প্রিয়ে, হাটে ভাঙি হাঁড়ি।'
সব ছেড়ে দিয়ে করিলাম বিয়ে, হিন্দুরা ক'ন আড়ি চাচা!'
যবন না আমি কাফের ভাবিয়া খুঁজি টিকি দাড়ি, নাড়ি কাছা!
অমনি বন্ধ চিঠি তাড়াতাড়ি।
মৌ-লোভী যত মৌলবী আর 'মোল্লারা কন হাত নেড়ে,
দেব-দেবী নাম মুখে আনে, সবে দাও পাজিটার জাত মেরে!
ফতোয়া দিলাম -কাফের কাজী ও,
যদিও শহীদ হইতে রাজী ও!

'আমপারা'-পড়া হাম-বড়া মোরা এখনো বেড়াই ভাত মেরে!
হিন্দুরা ভাবে, 'পার্শী-শব্দে কবিতা লেখে, ও পা'ত-নেড়ে!'
তবে এসব কিছুই পরোয়া করেননি তিনি। বলেছেন :
'পরোয়া করি না, বাঁচি বা না-বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে,
মাথার উপরে জ্বলিছেন রবি, রয়েছে সোনার শত ছেলে।
প্রার্থনা করো যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস,
যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ!'

অবশ্য এ কথা বলা যায় যে, গুরু হাফিজের চেয়ে শিষ্য নজরুলের ভাগ্য কিছুটা সুপ্রসন্ন ছিল। কারণ, হাফিজের মতো মৃত্যুর পরেও তাঁকে শত্রুদের বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি। নজরুলের পরম প্রত্যাশা ছিল মৃত্যুর পর মসজিদের পাশেই যেন তাঁর দাফন হয়; যাতে তিনি গোরে থেকেই মোয়াজ্জিনের আজান শুনতে পান। যে কথা তিনি তাঁর গানে এভাবেই উল্লেখ করেছেন :

'মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই।
যেন গোরে থেকেও মোয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই।
আমার গোরের পাশ দিয়ে ভাই নামাজীরা যাবে,
পবিত্র সেই পায়ের ধ্বনি এ বান্দা শুনতে পাবে।
গোর-আজাব থেকে গুনাহগার পাইবে রেহাই।।'

১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ২৯ আগস্ট ইরানের বুলবুল হাফিজ শিরাজির ভাব-শিষ্য বাংলার বুলবুল কাজী নজরুল ইসলাম এই ধূলির ধরার মায়া ত্যাগ করে অনন্ত যাত্রা করেন। বাংলাদেশের তদানীন্তন সরকারের সিদ্ধান্তক্রমে তাঁকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে সমাহিত করা হয়। সেই থেকে আজ অবধি গোরে থেকেও প্রতিদিন পাঁচ বার কবি মোয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাচ্ছেন। শুনতে পাচ্ছেন নামাজীদের পবিত্র পায়ের ধ্বনি।

লেখক : অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

# জালাল উদ্দিন রুমির কবিতায় অধ্যাত্মপ্রেম ও মূল্যবোধ

ড. মো. কামাল উদ্দিন

মুসলিম বিশ্বে সুফিবাদের উৎকর্ষে শীর্ষস্থানীয় কবি জালাল উদ্দিন রুমি। তাঁর কবিতার আলো ছড়িয়ে আছে বিশ্বজুড়ে। আধুনিককালেও রুমির কবিতার আবেদন এতটুকু ম্লান নয়। মানুষের জীবনের লক্ষ্য মহান রবের সান্নিধ্য লাভ। তাঁরই ভালোবাসায় জীবন উৎসর্গ করার ভেতর লুকিয়ে আছে মানুষের জীবনের সফলতা। মহান আল্লাহর সাথে মানুষের আত্মিক সম্পর্কই অধ্যাত্মপ্রেমের জন্ম দেয়। রুমির কবিতার পরশে অন্তর এক প্রেমময় অনুভবে ভরে যায়। যা প্রাণ ও প্রেমের প্রবহমাণ ঝরনাধারায় প্রবাহিত। সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে এর অবস্থান। সত্যের সৌন্দর্যে এর বিকাশ। মূল্যবোধ ব্যতীত কোনো সাহিত্যই পূর্ণতা লাভ করে না। তাঁর কবিতায় মূল্যবোধের ভাবধারা উচ্চকিত হয়। এর মধ্য দিয়েই অনুরণিত হয় জীবনের রূপ। কারণ, কবিতা শিল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শাখা। সমগ্র পৃথিবীতে কবিতার আবেদন অন্যরকম। আকাশের বিশালত্বের মতো কবিদের ভাবনার আকাশও বিশাল। ভাষা ও কালের পরিধি পেরিয়ে তাঁরা কবি হয়ে ওঠেন। মাওলানা রুমি এমনই একজন ব্যক্তিত্ব। মূলত রুমির আধ্যাত্মিক জগতের চিন্তাধারা কবি সানায়ি থেকেই সূচিত হয়। পরবর্তীকালে ফরিদ উদ্দিন আত্তারের মাধ্যমে তা বিকশিত হয়ে জালাল উদ্দিন রুমির মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে। রুমির কাব্যভাবনা শামস তাবরিযির প্রভাবেই আধ্যাত্মিকতার সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হয়।

ফারসি সাহিত্যের অন্যতম প্রধান দিকপাল জালাল উদ্দির রুমির জন্ম আফগানিস্তানের বাল্খ শহরে ১২০৭ সালে। পিতা বাহাউদ্দিন ওয়ালাদ একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। ধার্মিক ও প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে তিনি 'সুলতানুল উলামা' নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। বাল্খ্ এ তাঁর বহু অনুসারী ছিল। বালখের বাসিন্দারা তাঁকে 'বাল্খি' নামেই আখ্যায়িত করতেন। পিতামহ হুসামুদ্দিন উচ্চ পর্যায়ের একজন সুফি ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তৎকালীন অত্যাচারী শাসকদের নির্যাতন থেকে রক্ষা পেতে হাজার হাজার মানুষ বাল্খ ত্যাগে বাধ্য হন। রুমির পিতাও সেসময় হেরাত ও তুসের পথ ধরে ১২১৯ সালে নিশাপুরে গিয়ে পৌঁছান। সেখানেই সাক্ষাৎ হয় সুফিকবি ফরিদ উদ্দিনের সাথে। তিনি বালক রুমিকে দেখে তাঁর পিতাকে বলেন যেন রুমির বিষয়ে তিনি অধিক যত্নশীল হন। এছাড়াও তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন, 'এই সন্তানের যত্ন নিও। অচিরেই সে তার উষ্ণ নিঃশ্বাসে উত্থিত প্রেমের আগুনে এই ধরণির প্রেমিকদের পোড়াবে।'

শামস তাবরিযির সান্নিধ্যের ফলেই রুমির জীবন আধ্যাত্মিকতায় মোড় নেয়। একে একে জীবনের গূঢ় রহস্যের উন্মোচন ঘটে। অধিকাংশ গবেষকের মতে ১২৪৪ সালে শামসের কুনিয়ায় আগমন ঘটে। তার সাথে রুমির সাক্ষাতের বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত থাকলেও এটি প্রমাণিত যে, শামস তাবরিযির সান্নিধ্যই রুমিকে আধ্যাত্মিকতার পথে ধাবিত করে। এমনকি তাঁরই বিরহে রুমি রচনা করেন বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'দিওয়ানে শামস তাবরিযি'। রুমির আধ্যাত্মিক জীবনে শামস তাবরিযির প্রভাব অতুলনীয়।

শামস তাবরিযির প্রতি রুমির অনুরাগ প্রকাশ পায় কবিতার ছন্দে ছন্দে। তাঁর বিচ্ছেদে রুমির অন্তর ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। শামসের বিরহে কবি রুমি অসংখ্য কবিতা রচনা করেন। তাঁর সান্নিধ্যের ফলে মনোজগতে তৈরি হয়েছিল এক নতুন দিগন্ত। অতীতের সবকিছু ভুলে কবি নতুন ভুবনে প্রবেশ করেন। তাঁর প্রতি প্রেমের চিরায়ত অনুভূতির সৃষ্টি হয়। তারপর রুমি একের পর এক কবিতা লিখে যেতে থাকেন। কবিতার অন্তর্গত ভাবনায় বহুমাত্রিক ভাবনা ছড়িয়ে যায়। এসবের মর্মমূলে উচ্চারণ হয় শামসের প্রতি নিবিড় ভালোবাসার ছোঁয়া।

জালাল উদ্দিন রুমির অনবদ্য সৃষ্টি 'মসনবি'। বিশ্বের নানা ভাষায় অনূদিত হয়ে সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থের তালিকায় শোভিত হচ্ছে। ইসলামি সংস্কৃতির অন্যতম ধারক তাঁর 'মসনবি'। শিল্প-সাহিত্যের মননশীলতায় অন্তরকে আলোময় করে তোলে। মহান রবের সান্নিধ্যে উপনীত হবার ভাবনাগুলো ফুলে ফলে শোভিত হয়ে মনের ভেতর এক প্রকার ঢেউয়ের অবতারণা ঘটে। যা অন্তর্লোকে উচ্ছ্বসিত হয়ে বিকাশ লাভ করে। 'মসনবি'কে বলা হয় তাওহিদের কণ্ঠস্বর। আরো বলা হয়, প্রেমের সংগীতমালা, দর্শনের তত্ত্বভাণ্ডার, শরিআত ও তরিকতের গূঢ় রহস্যের বিশ্বকোষ। কুরআন ও

হাদিসের মূল সুরের নির্যাস ঝরে পড়ে কবিতার ছন্দে ছন্দে।

মসনবি মানে দ্বিপদী কবিতা। রুমির 'মসনবি'র পুরো নাম ''মসনবিয়ে মা'নাবি'' অর্থাৎ আধ্যাত্মিক দ্বিপদী কবিতা। যা উপমহাদেশে 'মসনবিয়ে রুমি' হিসেবে খ্যাত, যদিও ইরানে তা 'মসনবিয়ে মওলাভি' বা 'মসনবিয়ে মা'নাবি' নামে সমধিক পরিচিত। এ বিশাল 'মসনবি'র পঙ্‌ক্তি সংখ্যা নিয়েও গবেষকগণের মাঝে ভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। অধ্যাপক নিকলসনের মতে, ছয় খণ্ডের পূর্ণাঙ্গ 'মসনবি'তে সর্বমোট ২৫,৬৩২ টি পঙ্‌ক্তি রয়েছে। ড. যবিহ উল্লাহ সাফার মতে, এ গ্রন্থের পঙ্‌ক্তি সংখ্যা ২৬,০০০ টি। আর সমকালীন সাহিত্য সমালোচক ড. তাওফিক হা. সোবহানির মতে, ৬ খণ্ডের পূর্ণাঙ্গ মসনবিতে সর্বমোট ২৬,০৩২ টি পঙ্‌ক্তি রয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম খণ্ডে ৪,০০৩ টি, দ্বিতীয় খণ্ডে ৩,৮১০ টি, তৃতীয় খণ্ডে ৪,৮১০ টি, চতুর্থ খণ্ডে ৩,৯৫৫ টি, পঞ্চম খণ্ডে ৪৬৩৮ বটি এবং ষষ্ঠ খণ্ডে ৪,৯১৬ টি পঙ্‌ক্তি। রুমির অপর এক কাব্যগ্রন্থ 'দিওয়ানে শামস তাবরিযি'। ড. মোহাম্মদ মুঈনের মতে, এ গ্রন্থের পঙ্‌ক্তি সংখ্যা ৫০,০০০। অপরদিকে ড. তাওফিক হা. সোবহানির মতে, এতে গজল ও তারজিবান্দ পঙ্‌ক্তির সংখ্যা ৩৬,৩৬০ টি, রুবাঈ পঙ্‌ক্তির সংখ্যা ৩,৬৭৬ টি, আর সর্বমোট পঙ্‌ক্তি সংখ্যা এসে দাঁড়ায় ৪০,০৩৬ টি। তাছাড়া তিনি রচনা করেন 'ফিহ মা ফিহ', 'মাকাতিব' ও 'মাজালেসে সাব'আ'।

'দিওয়ানে শামস্ তাবরিযি' বা 'দিওয়ানে কবির' নামে খ্যাত কাব্যগ্রন্থটি রুমির দ্বিতীয় বৃহত্তম কাব্যগ্রন্থ। গজল ও চতুষ্পদি কবিতার সংকলন এ কাব্যগ্রন্থে তুর্কি ভাষার কবিতাও স্থান লাভ করেছে। ফারসি সাহিত্য সমালোচক বদিউজ্জামান ফোরুযানফারের মতে, দিওয়ানে শাম্‌স তাবরিযির সর্বশেষ সংস্করণ ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সম্পন্ন হয়। এতে গজল ও তারজিবান্দ কবিতার পঙ্‌ক্তি সংখ্যা ৩৬,৩৬০ টি, রুবাইয়াতের পঙ্‌ক্তি সংখ্যা ৩,৮৭৬ টি। সর্বমোট কবিতার পঙ্‌ক্তি সংখ্যা হলো ৪০,২৩৬ টি। শামসের প্রতি কবির আধ্যাত্মিক সম্পর্ক, প্রেম, অনুরাগ ও গভীর ভালোবাসার চিহ্ন বয়ে বেড়ায় দিওয়ানে শাম্‌স তাবরিযি। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে কুনিয়ার অমুসলিম ব্যক্তিবর্গের সাথে রুমির সম্পর্কও চিত্রিত হয় এতে। আর গ্রন্থটি তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু শামসের নামে উৎসর্গীকৃত। কাব্যিক ও শৈল্পিক মানেও গ্রন্থটি উন্নত ও সমৃদ্ধ। এ প্রসঙ্গে Encyclopaedia of Islam -এ বলা হয়েছে- The Diwan, containing ghazals and quatrains, there are also Greek and Turkish verses in this, the presence of which shows a certain connection with sections of the common folk and also with the non-Muslim elements of the Konya population.

সুফিকবি হাকিম সানায়ি ও ফরিদ উদ্দিন আত্তারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব পরিদৃষ্ট হয় রুমির রচনাবলিতে। আত্তারের পাখিদের গল্পকথা আর সানায়ির শৈলী যেন ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে রুমির কবিতার পরতে পরতে। পূর্বসূরি কবিদের যোগ্য উত্তরসূরি কবি রুমি। অধ্যাত্মভাবধারার অনুপুঙ্খ চিত্র অঙ্কিত হয় তাঁর কবিতায়। জীবনের আশাবাদী আর নিরাশার দোলাচলে ডুবে যাওয়া মানুষেরা মনের কথা খুঁজে বেড়ায় রুমির কাব্যগাথায়। স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির অব্যক্ত ভাবনা ঝরে পড়ে তাঁর কবিতায়। আত্তার ও সানায়ি আলোড়িত করে রুমির কাব্যভুবন। তাই তো রুমির কণ্ঠে অনুরণিত হয়-

عطار شیخ ما سنائیست پیشرو
ما از پی سنائی و عطار آمدیم

'আত্তার আমাদের পথপ্রদর্শক, সানায়ি অগ্রদূত
আমরা আত্তার ও সানায়ির পদাঙ্ক অনুসরণ করেছি মাত্র।'

মানুষ সৃষ্টির মূলে রয়েছে প্রেমের রহস্য। চিরায়ত ভালোবাসার প্রকাশ। প্রেম নানা নামে সংজ্ঞায়িত। জাগতিক প্রেম ও ঐশী প্রেম। প্রকৃতির সৌন্দর্য মানবমনে প্রেমের অনুভূতি সৃষ্টি করে। আবার কখনো বা দেখা যায় মানুষেরই সৃষ্টিকর্ম মানুষের মনকে আকৃষ্ট করে। জগতের প্রেম বর্ণিল রূপে মানুষের জীবনে স্থান করে নিয়েছে অতি সহজেই। সুফিকবিরা এই অন্তর্নিহিত অনুভূতির ছবি এঁকেছেন নিজস্ব স্বকীয়তায়। দেখিয়েছেন চিরন্তন প্রেমের শাশ্বত পথ। আলোড়িত করেন অন্তর্জগতের স্বরূপ।

জীবন ও মৃত্যু একই সূত্রে গাঁথা। সবাইকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। মানুষের এ পৃথিবীতে আগমন রূহের জগৎ হতে। আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে হতে প্রতিটি রূহ পৃথিবীর আলো দেখেছে। কবি রূহের জগতকে বাঁশঝাড়ের সাথে তুলনা করেন। বাঁশঝাড় থেকে একটি কেটে ফেললে অপরটির অস্তিত্ব বোঝা যায়। আলমে আরওয়াহ হতেও যখন একটি করে আত্মা এ পৃথিবীতে আসে তখন মনে হয় যেনো বাঁশঝাড় থেকে বাঁশকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।

বিচ্ছিন্নতার এই দৃশ্যে প্রতিটি আত্মা পুনরায় মিলিত হবার আশে কান্নারত। যেন মানবাত্মার এ বন্দিত্ব হতে মুক্ত হয়ে পরমাত্মার সাথে মিলিত হবার বেদনায় কাতর। হৃদয়ের গহিনে বেজে ওঠে আর্তনাদ। নিজের উৎস মূলে ফিরে যাওয়ার এই কান্নার নাম প্রেম। মাওলানা রুমি অধ্যাত্মপ্রেমের স্বরূপ উন্মোচিত করেন বাঁশঝাড় ও বাঁশরির সুরের রূপকের মাধ্যমে। কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়-

بشنو از نی چون حکایت می کند
از جدایی ها شکایت می کند
کز نیستان تا مرا ببریده اند
در نفیرم مرد و زن نالیده اند
سینه خواهم شرحه شرحه از فراق
تا بگویم شرح درد اشتیاق

মাওলানা রুমির সমাধির অভ্যন্তর ভাগ

‘শোনো, বাঁশি কী গল্পকথা তুলে ধরছে
বিরহ-বিচ্ছেদের অভিযোগ বর্ণনা করছে।
যখন আমাকে বাঁশবন থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে
আমার কান্না ও আর্তনাদে নারী-পুরুষ সকলেই কেঁদেছে।
বিরহ-বেদনায় ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ের আমি প্রত্যাশী
যেন ব্যক্ত করতে পারি প্রেম-বেদনার অনুভূতি।’

আধ্যাত্মিক প্রেম এক চিরন্তন অনুভূতি। এর মধ্যেই মানুষের মুক্তির পথ নিহিত। আল্লাহর সাথে রূহের যে সম্পর্ক তা অবিচ্ছেদ্য। যা ছিন্ন করার ক্ষমতা কেউ রাখে না। যদিও জাগতিক জীবনের আয়োজনে মানুষ দিশেহারা। একদিকে যেমন মানুষ এ ধরণিতে এসে শান্তিময় জীবন লাভ করেছে। অন্যদিকে প্রতি মুহূর্তে রূহ বা আত্মাকে প্রতিকূলতার বিরূদ্ধে করতে হচ্ছে সংগ্রাম। এ দ্বন্দ্বের দোলাচলে কখনো বা নফসের চাহিদা তাকে পরাভূত করে ফেলে আবার কখনো বা রূহ শক্তিশালী হয়ে প্রভাব বিস্তার করে সম্মুখপানে এগিয়ে চলে। জীবনযুদ্ধের এ টানাপোড়েনে আত্মা চায় অতি শীঘ্রই পরমাত্মার সান্নিধ্যে গিয়ে একাকার হয়ে মিশে যেতে। পরমাত্মার সাথে আত্মার মিলনের যে অধীর আগ্রহ, দীর্ঘ প্রতীক্ষা তার স্বরূপ প্রকাশ্য হয়ে ওঠে রুমির ‘মসনবি’তে।

هر کسی کو دور ماند از اصل خویش
باز جوید روزگار وصل خویش
سر من از ناله‌ء من دور نیست
لیک چشم و گوش را آن نور نیست

‘যে কেউ তার মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে
পুনরায় সে তার মিলনযুগ অনুসন্ধান করে।
আমার গোপন রহস্য আমার কান্না ও আবেগ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়
কিন্তু চক্ষু ও কর্ণের সেই জ্যোতি নেই তা অনুভব করার।’

রুমির ‘মসনবি’ আধ্যাত্মিক সাধনা ও মূল্যবোধের চেতনায় ভরপুর। সুফিতত্ত্বের মূলকথা মহান আল্লাহর অস্তিত্ব, রূহ বা আত্মার প্রকৃতি, জীবন-মৃত্যু ও জগতের রহস্যময় ভাবনা। জীবনের বর্ণিল চিত্রের অবয়ব ধরা পড়ে তাঁর মসনবিতে। সাহিত্যিক ভাবধারার সমবায়ে নৈতিক চিন্তাধারার বিশ্লেষণ ও কাব্যিক উপস্থাপনায় ইসলামি বিশ্বে এর তুলনা মেলা ভার। পার্থিব বিষয়াবলির উপমা প্রদানের মাধ্যমে বৈষয়িক ভোগ-বিলাস, লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ প্রভৃতির প্রতি অনীহা সৃষ্টি হয়। আর পারলৌকিক জীবনের প্রতি অনুগামী করে কবিতার ছন্দময় ভাবধারা। আল কুরআনে মানুষের জীবনের সাফল্যের মূলমন্ত্র বিধৃত হয়েছে। আর রুমির কবিতায় পার্থিব জীবনের অসারতা অনুরণিত হয়। ‘মসনবি’তে এ ধারায় যেন বিশেষ অনুভবের চিত্র প্রকাশ পায়। মূল্যবোধের চেতনা ও শিক্ষণীয় বিষয়ের অবতারণায় ‘মসনবি’ যেন কুরআনি চেতনারই ব্যাখ্যারূপে চিহ্নিত হয়। ফারসি ভাষায় যেন কুরআনি ভাবনার সারনির্যাসে মিশে আছে রুমির ‘মসনবি’। কবির ভাষায়-

مثنوی معنوی مولوی
هست قرآن در زبان پهلوی

‘মৌলভির আধ্যাত্মিক বিষয় সম্বলিত মসনবি
পাহলভি ভাষায় কুরআন (এরই ব্যাখ্যারূপ)।’

ইসলামি নৈতিক মূল্যবোধের বর্ণিল রূপ চিত্রিত হয়েছে রুমির কবিতায়। মানুষের জীবনে চাওয়া-পাওয়ার জিহ্বা বাড়তে থাকে দিন দিন। জীবনের কল্যাণকর বিষয়াবলি কাব্যিক ছন্দ, সুরের মূর্ছনা ও আবেগ-অনুভূতির সমাহারে ভরে ওঠে। মানুষের বৈষয়িক

জীবনে ভোগের ক্ষমতা খুব বেশি নয়। এমনকি অগাধ বিত্তবানের পক্ষেও সাধ্যের অতীত ভরণ-পোষণের অবকাশ নেই। ইচ্ছে করলেই অনেক বেশি খাবার খাওয়ার সুযোগ কোথায়? ক্ষেত্রবিশেষে খাবারের পরিমাণ আরও কমে যায়। অথচ মানুষের চোখের নেশা কাটে না। লালসার জিহ্বা সংকুচিত হয় না। তাই তো রুমির কণ্ঠে ঝরে পড়ে সুরের মূর্ছনা–

کر بریزی بحر را در کوزه ای
چند گنجد قسمت یک روزه ای

'সমুদ্রকে যদি একটি কলসিতে ঢেলে দাও
কতটুকুই বা ধারণ করবে মাত্র একদিনের সমপরিমাণ।'

মানবিক মূল্যবোধের চেতনা জীবনকে সুন্দর ও সুখময় করে তোলে। অসুন্দরের আঁধার বিদায় নেয়। মূল্যবোধের দিকগুলো যেন জীবনকে নতুন মাত্রায় বিকশিত করে। অন্তরের সব কলুষতা ধুয়ে মুছে সাফ করে দেয়। মানুষের প্রতি সহানুভূতি জাগিয়ে তোলে। এক নির্মল আনন্দময় জীবন উপহার দেয়। যে জীবনে আছে শুধু ভালোবাসার পরশ; হিংসা-বিদ্বেষের লেশমাত্র নেই। পরস্পরের প্রতি দায়বদ্ধতা মানুষের জীবনকে শ্রদ্ধাশীল করে তোলে। প্রতিজ্ঞাপালন ও বিশ্বস্ততা জীবনকে সত্যপথে পরিচালিত করে। যে পথে নেই কোনো হারানোর বেদনা; আছে শুধুই খুশির ঝলক। রুমির কবিতায় অনুরণিত হয়–

**ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, সোনা-রুপা ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্য সবার কাছেই আকর্ষণীয়। এগুলো মানুষের ভোগের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে ভোগের মাত্রা বেড়ে যাওয়াটাই সব সমস্যার মূল। যখনই অপরিমেয় পাওয়ার নেশায় বিভোর হয়ে পড়ে মানুষ তখনই মানুষের আত্মা আপন শক্তি হারিয়ে ফেলে। মানুষ পরিণত হয়ে যায় নফসের দাসে।**

وعده ها باید وفا کردن تمام
و ر نخواهی کرد باشی سرد و خام
وعده کردن با وفا باشد بجان
تا ببینی در قیامت فیض آن

'প্রতিশ্রুতি অন্তর দিয়ে ভালোভাবে পালন করে নাও
অন্যথায় তুমি অলস ও অপূর্ণরূপে বিবেচিত হবে।
প্রতিজ্ঞা বিশ্বস্ততার সাথে মনে প্রাণে পূর্ণ করে নাও
পরকালে তুমি দেখতে এর সঠিক মর্যাদা।'

মানুষের জন্য এই পৃথিবী ও এর সব উপকরণ লোভনীয় ও আকর্ষণীয়রূপে সৃষ্টি করা হয়েছে। ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, সোনা-রুপা ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্য সবার কাছেই আকর্ষণীয়। এগুলো মানুষের ভোগের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে ভোগের মাত্রা বেড়ে যাওয়াটাই সব সমস্যার মূল। যখনই অপরিমেয় পাওয়ার নেশায় বিভোর হয়ে পড়ে মানুষ তখনই মানুষের আত্মা আপন শক্তি হারিয়ে ফেলে। মানুষ পরিণত হয়ে যায় নফসের দাসে। এই গোলামির মানসিকতাই তাকে অন্যের অধিকার হননে প্ররোচিত করে। অথচ এই প্রাপ্তিগুলো খুবই সাময়িক। এমনকি চোখের সামনের সম্পদও বিত্তবানের কোনো কাজে লাগে না। উপকারে আসতে পারে না। তাই এই জাগতিক চাওয়া-পাওয়ার প্রতি নিরুৎসাহিত করেন কবি নিজেই–

بند بگسل باش آزاد ای پسر
چند باشی بند سیم و بند زر
کوزه ی چشم حریصان پر نشد
تا صدف قانع نشد پر در نشد

'হে বৎস! ধন-সম্পদের বন্ধন ছেড়ে স্বাধীন হয়ে যাও
আর কত কাল সোনা-রুপার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকবে?
লোভী ব্যক্তির চক্ষু-পেয়ালা পূর্ণতা লাভ করে না
অল্পে তুষ্ট না হলে ঝিনুকও মুক্তায় পূর্ণ হয় না।'

ভাষিক, কালিক ও ভৌগোলিক সীমারেখা পেরিয়ে রুমির 'মসনবি' হয়ে উঠেছে বিশ্বসাহিত্যের এক অমূল্য রত্ন। মানুষের অন্তর্লোকে এক অনাবিল ভালোবাসার ভুবন সৃষ্টি হয় তাঁর কবিতার ছোঁয়ায়। মানুষের অন্তরে চিরায়ত প্রেমের দ্যুতি জ্বলে ওঠে। মহাজাগতিক ভাবনায় জ্যোতির্ময় হৃদয় মানুষের কল্যাণে এগিয়ে আসে। মূল্যমানের এক অভূতপূর্ব পরশ ছড়িয়ে পড়ে মনের আকাশে। মানুষের ভেতর জগতে রুমির চেতনার প্রভাব বিস্তারিত হলে পৃথিবীও হয়ে উঠবে অনাবিল নিবাস। ভালোবাসার চারণভূমি। মানুষও লাভ করবে সুখের ছোঁয়া। যেখানে থাকবে না কোনো হিংসা-বিদ্বেষ আর লালসার মোহ। শুধুই মহাজাগতিক ভাবনা অন্তরকে আলোর প্রতি ধাবিত করবে। সৃষ্টি হবে নতুন এক ভুবন। আধ্যাত্মিক চেতনা আর মহিমায় অন্তর হবে আলোকিত। আর পৃথিবীও হয়ে উঠবে আলোময়। মানুষের জীবন হয়ে উঠবে ঐশ্বর্যময়।

লেখক: অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

# পারভীন এতেসামি : মানবতার কবি
## জীবনী, সাহিত্যকর্ম এবং তাঁর সম্পর্কে মনীষীদের মন্তব্য

পারভীন এতেসামি একজন ইরানি লেখক, কবি এবং বিংশ শতাব্দীর ফারসি সাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছিলেন। যিনি ইরানের সবচেয়ে জনপ্রিয় নারী কবি হিসেবে পরিচিত। তিনি কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস ও নাটকের মতো বিভিন্ন সাহিত্যিক শৈলীতে সাহিত্যকর্ম রচনা করেছেন। ইরানের সমকালীন সাহিত্যিকগণ এই ক্ষণজন্মা ও প্রথিতযশা কবির প্রশংসা করেছেন এবং তাঁকে ইরানের সাহিত্যের ইতিহাসে সমকালীন কবিদের অন্যতম কবি হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

### পারভীন এতেসামির জন্মস্থান ও জন্মতারিখ

পারভীন এতেসামি নামে পরিচিত রুখশান্দে এতেসামি ২৫ এসফান্দ ১২৮৫ হিজরি শামসি মোতাবেক ১৭ মার্চ ১৯০৭ সালে তাবরিযে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ইউসুফ এতমাদি আশতিয়ানি ছিলেন কাজার যুগের শেষের দিকে বিখ্যাত রাজনীতিবিদ, লেখক ও অনুবাদক। সেই সময় তিনি 'বাহার' নামের একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করতেন। তাঁর বাবা ছিলেন সাংবিধানিক আন্দোলনের সমর্থক এবং তিনি ডক্টর আলি আকবর দেহখোদা ও মালেক উশ শোয়ারা বাহারের মতো শিক্ষকদের সাথে চলাফেরা করতেন। তাঁর মা ছিলেন আখতার ফতুহি, যিনি 'মুকাদ্দাম আল-এদালা' উপাধিপ্রাপ্ত মির্জা আবদুল হোসেইনের কন্যা এবং 'শোরি' ছদ্মনামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন কাজার যুগের একজন বিশিষ্ট কবি এবং তাবরিয ও আজারবাইজানের অধিবাসী।

### শৈশব ও শিক্ষা

ছোটবেলায় তিনি তাঁর পিতার সঙ্গে তেহরানে চলে আসেন। তিনি তাঁর বাবার কাছ থেকে ফারসি সাহিত্য এবং আরবি সাহিত্য শিখেছিলেন। তিনি তাঁর অধ্যয়নকালে অসাধারণ ছাত্রী ছিলেন, এমনকি তিনি ইংরেজি ভাষায়ও বিভিন্ন গল্প পড়তে পারতেন। জ্ঞান অর্জনের প্রতি খুবই আগ্রহী ছিলেন এবং তাঁর পক্ষে যতটুকু সম্ভব হতো সবকিছু সম্পর্কে জানার চেষ্টা করতেন; এজন্যই তিনি তাঁর আগের স্কুলে কিছু সময়ের জন্য ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য পড়িয়েছিলেন। পারভীন তাঁর অসাধারণ প্রতিভার কারণে আট বছর বয়সে কবিতা লিখা শুরু করেন। ১৩০৩ হিজরি শামসিতে তিনি আমেরিকান গার্লস কলেজ থেকে পড়াশুনা শেষ করেন। পারভীনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন সারওয়ার মেহকমেহ্ তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, তিনি একজন নম্র, ভদ্র ও মার্জিত আচরণকারী ব্যক্তি।

### শৈশব এবং কৈশোরের কবিতা

পারভীন এতেসামির প্রথম কবিতাগুলো সাত বছর বয়সে লেখা হয়েছিল এবং তাঁর সুন্দর সুন্দর কবিতাগুলোর মধ্যে কিছু কবিতা কিশোর বয়সের (১১ থেকে ১৪ বছরের)। ছোটবেলা থেকেই তাঁর বাবা তাঁর কবিতার অন্ত্যমিল ও ছন্দ শেখার ক্ষেত্রে সহায়তা করেছেন। এই বয়সে তাঁর লেখা বিখ্যাত কবিতাগুলোর মধ্যে 'গওহার ভা সান্‌গ' (মনি-মুক্তা ও পাথর), এই মোরগাক (হে ছোট পাখি), আশকে ইয়াতিম (এতিমের অশ্রু), সায়ী ভা আমাল (প্রয়াস ও কর্ম) এবং আনদুহে ফাকর (দারিদ্র্যের দুঃখ) উল্লেখযোগ্য। পারভীনের বাবা তাঁর কিছু কবিতা 'বাহার' ম্যাগাজিনে প্রকাশ করতেন যা পারভীনের জন্য বড় অনুপ্রেরণা ছিল। এই অনুপ্রেরণাই পারভীনের কবি হিসেবে প্রতিভা বিকাশের সহায়ক হিসেবে ছিল। তিনি সেই সময়ে পিতার সংস্পর্শে থেকে সাহিত্যিক আসরে আসা-যাওয়া করতেন।

### বিবাহ ও স্বামী

পারভীন এহতেসামি তাঁর বাবার চাচাত ভাই ফজলুল্লাহ হুমায়ুন ফাল নামে একজন সেনা অফিসারের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়ের চার মাস পরে পারভীন তাঁর স্বামীর সাথে কেরমানশাহ চলে যান। সে সময় তাঁর স্বামী কেরমানশাহর সেনাপ্রধান ছিলেন। বিয়ের দুই মাস পরে স্বামীর সাথে নৈতিকতা ও মানসিকতার পার্থক্যের কারণে ১৩১৪ হিজরি শামসির মোরদাদ মাসে তাঁদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। পারভীনের শৈল্পিক ও নরম মন-মানসিকতার সাথে স্বামীর কঠোর সামরিক আচরণ সম্পূর্ণরূপে বিপরীত ছিল এবং এটিই ছিল পারভীনের বিচ্ছেদের মূল কারণ।

### মৃত্যু ও সমাধিস্থল

পারভীন এতেসামি ১৫ ফারভারদিন ১৩২০ হিজরি শামসিতে টাইফয়েড ও কিডনি রোগে আক্রান্ত হন। হাসপাতালে ব্যর্থ চিকিৎসার পরে তিনি তেহরানে নিজ বাড়িতে ফিরে যান এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। তিনি কোম শহরে ফাতিমা

মাসুমার মাজারে পারিবারিক সমাধিস্থলে সমাহিত হয়েছেন। পারভীন এতেসামির মৃত্যু ইরান ও বিশ্বের সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি বেদনাদায়ক ঘটনা হিসেবে বিবেচিত। তাঁর মৃত্যুর পর একটি কবিতা (কেতয়ে) পাওয়া যায়, যা তিনি তাঁর সমাধির জন্য কখন লিখেছেন জানা যায়নি; সেই কেতয়েটি তাঁর সমাধির পাথরে খোদাই করা হয়।

اینکه خاک سیهش بالین است
اختر چرخ ادب پروین است
گر چه جز تلخی ز ایام ندید
هر چه خواهی سخنش شیرین است

এই যে তার কালো মাটির বিছানা
শিষ্টাচারের আকাশের তারকা পারভীন
যদিও তিক্ততা ছাড়া কিছুই দেখেনি
যাই বলো তার কথা মিষ্টি
পারভীন এতেসামির কাব্যগ্রন্থ

পারভীন এতেসামির জীবন বাধা-বিপত্তিতে পূর্ণ ছিল। তবুও তিনি সুন্দর ও মূল্যবান কবিতা লিখতে সফল হয়েছিলেন। পারভীনের কাব্যগ্রন্থটি ফারসি ভাষায় লিখা হয়েছে এবং তার কবিতাগুলোতে প্রেম, যুদ্ধ, আশা, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। পারভীন এতেসামির ২০টিরও বেশি কবিতার বই এবং ছোট গল্প ও উপন্যাসের সংকলন রয়েছে। তাঁর কবিতাগুলোর বিষয়বস্তু ছিল প্রধানত আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতা। তিনি জ্ঞান ও নৈতিক বিষয়গুলো সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করার চেষ্টা করতেন, যাতে পাঠকরা প্রভাবিত হয়। পারভীনের কবিতায় প্রাচীন মহান কবিদের কাব্যশৈলীর প্রভাবও দেখা যায়। তিনি কবি হাফিজ ও সাদির প্রভাবে খোরাসানি ও ইরাকি শৈলীর সংমিশ্রণে কবিতা রচনা করেছেন। পারভীন এতেসামি মানাজেরেহ্ কাব্যশৈলীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর কাব্যসংকলনে মানাজেরেহ্, মসনভি, কেতয়ে ও কাসিদা রয়েছে।

তাঁর কবিতাগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়ঃ প্রথম ভাগ, যেটি খোরাসানি শৈলীতে লিখা হয়েছে এবং উপদেশ ও নসিহত সম্পর্কিত এবং নাসির খসরুর কবিতার সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণির কবিতাগুলো ইরাকি শৈলীতে রচিত যার বেশিরভাগই কাহিনীভিত্তিক এবং সাদি সিরাজির কবিতার সাথে মিল রয়েছে। পারভীনের দ্বিতীয় ভাগের কবিতাগুলো বেশি জনপ্রিয়।

**মনীষীদের মন্তব্য**

পারভীন বড় বড় ব্যক্তিবর্গের, যেমন মালেক উশ শোয়ারা বাহার, আলি আকবর দেহখোদা, আব্বাস ইকবাল আশতিয়ানি, নাসরুল্লাহ তাগভির, মোহাম্মদ কাজভিনি এবং সাঈদ নাফিসির উপস্থিতিতে তাঁর কবিতা পাঠ করতেন এবং তাঁদের থেকে অনেক উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা পেতেন।

এই সাহিত্যের আসরগুলোতে পারভীন তাঁর সময়ের কবি ও চিন্তাবিদ মালেক উশ শোয়ারা বাহারের সঙ্গে পরিচিত হন। বাহার পারভীনের কবিতাগুলো দেখে খুবই অবাক হয়েছিলেন। এমনকি প্রথমে তাঁর বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে, পারভীনের মতো তরুণ কবি এতো অসাধারণ কবিতা লিখতে পারেন। সেই সময় নারীদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য নিয়ে কথা বলার সুযোগ খুবই কম ছিল।

বাহার পারভীন এতেসামির কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা লিখতে গিয়ে পারভীনের কাব্যশৈলী সম্পর্কে এভাবে বলেনঃ 'এই কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি পৃষ্ঠা পড়ে এর দৃঢ়শৈলী ও পরিশীলিত ভাষা আমাকে এমনভাবে আকৃষ্ট করল যে, শুধু এই বইটিই সামনে নিয়ে বসলাম এবং সকল ব্যস্ততা ভুলে পুরো গ্রন্থটি পড়ে শেষ করলাম এবং অসীম আনন্দ উপভোগ করলাম।'

মালেক উশ শোয়ারা বাহার তাঁর কাব্যসংকলনের প্রস্তাবনায় বলেন : এই কাব্যগ্রন্থটি দুইটি শৈলী এবং অর্থ ও শব্দের একটি স্বতন্ত্র শৈলীর সংমিশ্রণ। এই শৈলীগুলোর একটি হলো খোরাসানের শৈলী, বিশেষ করে নাসির খসরু কোবাদিয়ানির, এবং অন্যটি হলো ইরাক ও ফারসি কবিদের শৈলী, বিশেষ করে শেখ সাদি শিরাজির। এই কাব্যগ্রন্থটি অর্থের দিক থেকেও দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনার মধ্যেও সেতুবন্ধন তৈরী করেছে। এই গ্রন্থটি একটি স্বতন্ত্র শৈলী নিয়ে এসেছে যা বর্তমান যুগের জন্য প্রযোজ্য এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূলভাব ও সত্য অনুসন্ধানের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে যা একটি অভিনব ও প্রজ্ঞাবহ শৈলীর সৃষ্টি করেছে।

পারভীন এতেসামি যেহেতু অল্প বয়সেই মৃত্যুবরণ করেন, অনেক কবিই তাঁর স্মরণে শোক কবিতা লিখেছেন। মালেকুশ শোয়ারা বাহারও তাঁর জন্য একটি কবিতা রচনা করেন। সে কবিতায়

পারভীনের মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশ করেন এবং পারভীনের কবিতার প্রশংসা করেন। কবিতাটি এমনভাবে লিখা হয়েছে যে, পারভীনের চিন্তাভাবনা এবং জীবনের কিছু দিকও সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

نهفته روی به برگ اندرون گلی محجوب
زباغبان طبیعت ملول و غمگین بود
زتاب و جلوه اگر چند مانده بود جدا
ولی ز نکهت او عنبرآگین بود

পাতার ভিতরে একটি লজ্জাবতী ফুল লুক্কায়িত ছিল
বাগানের মালী দুঃখী ও বিষণ্ণ ছিল
যদিও তার রশ্মি এবং জৌলুস কিছুটা আলাদা ছিল
কিন্তু তার বাগান সুগন্ধে ভরা ছিল

বাহার পারভীনের কবিতাগুলোকে 'প্রস্ফুটিত একগুচ্ছ ফুল' এর সাথে তুলনা করেছেন।

পারভীন এতেসামির বাড়ি

পারভীনের কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর সেই সময়ের একজন পণ্ডিত ব্যক্তি আল্লামা মোহাম্মদ কাজভিনি কাব্যগ্রন্থটি পড়ার পর তাঁর পিতাকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিতে তিনি বলেন: যে বিষয়টি বিশেষ করে আমাকে বিস্মিত করেছে, সেটি এই কবিতাগুলোর আধ্যাত্মিক দিক নয়, বরং এর ভাষাগত ও কৌশলগত দিক। তার কবিতাগুলোর মধ্যে রয়েছে শব্দ, পরিভাষা ও বাক্যের চমৎকার নির্বাচন। যেটি সকলেই জানে, এটি কোনো প্রতিভা নয়, বরং সম্পূর্ণভাবে অর্জিত; এবং এটি বছরের পর বছর অধ্যয়ন, আলোচনা, অনুশীলন, জ্ঞানী ও সাহিত্যিক ব্যক্তিবর্গের সাথে উঠাবসার ফল। কাজভিনি পারভীনকে 'নারী কবিদের রানি' হিসেবে অভিহিত করেন।

ফারসি সাহিত্যের বিখ্যাত লেখক দেহখোদা, পারভীন এতেসামির কবিতাগুলোকে উচ্চ মানের বলে মনে করতেন এবং তাঁর ছোট বয়সের কথা বিবেচনা করে তাঁকে ইরানের মহান কবিদের দলে স্থান দিয়েছেন এবং তাঁর কবিতাসমূহের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, তিনি তাঁকে 'অনন্য এবং বর্তমান যুগের উজ্জ্বল নক্ষত্র' বলে অভিহিত করেছেন।

মোহাম্মদ হোসাইন শাহরিয়ার পারভীন এতেসামিকে নিয়ে তাঁর একটি কবিতায় নতুন কাব্যশৈলীতে (সাবকে শেয়রে নও) লিখেছেন।

به راستی که یکی از نوابغ ادب است
میان شاعره‌ها تکنون نظیرش نیست
به یادم است که او شاعر شهیری بود
قصایدش به مجلات منتشر می‌شد

از آن پس من و او آشنای هم بودیم
خیال می‌کنم که او بیست سال کمتر داشت
هزار و سیصد و دو یا سه، او محصل بود
هنوز کالج و دارالمعلمین می‌دید
کتاب زیربغل داشت، در ورود از در
به زیر چادر مشکی وپیچه، ماهی بود

নিঃসন্দেহে তিনি একজন প্রতিভাবান সাহিত্যিক
কবিদের মধ্যে এখন পর্যন্ত তাঁর সমকক্ষ নেই।
আমার মনে পড়ে, তিনি একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন
তাঁর কবিতাগুলো বিভিন্ন পত্রিকা ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হতো।
তারপর থেকে আমি এবং তিনি একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হলাম
আমার মনে হচ্ছে তিনি বিশ বছরেরও কম বয়সী ছিলেন।
১৩০২ বা ১৩০৩ (হিজরি শামসিতে), তিনি ছাত্রী ছিলেন
তখনো কলেজ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতেন
তাঁর হাতে বই ছিল, দরজায় প্রবেশের সময়
কালো চাদরের নিচে যেন একটি চাঁদ ছিল।

অনেক গবেষক ও সাহিত্যিক পারভীন এতেসামির সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। তাঁদের মধ্যে মোহাম্মদ রেজা শাফিয়ী কাদকানি অন্যতম। তিনি পারভীনের কবিতা সম্পর্কে বলেন, পারভীনের কবিতা হলো জ্ঞান, বুদ্ধি ও অনুভূতির কবিতা এবং এটিতে ভিন্ন উপমা ও অদ্ভুত সাদৃশ্যের প্রয়োজন নেই। যখন আমি কিশোর বয়সে পারভীন এতেসামির কাব্যসংকলনটি প্রথমবারের মতো হাতে পেয়েছিলাম, তখন আমার এমন অনুভূতি হয়েছিল যা বর্ণনা করার মতো নয়। তাঁর প্রথম যে কবিতাটি আমাকে মুগ্ধ করেছে, সেটি ছিল কলেজের বিদায় অনুষ্ঠান উপলক্ষে লিখা একটি কবিতা যা এভাবে শুরু হয়েছিল:

ای نهال آرزو خوش زی که بار آورده ای
غنچه بی باد صبا گل بی بهار آورده ای

হে আশার বৃক্ষ, কত সুন্দর ফল এনেছ
বাতাসবিহীন কুঁড়িতে, বসন্ত ছাড়াই ফুল এনেছ

আমি জানি না এই কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলোতে কী লুকানো আছে যে, প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর পরেও আমি এখনো এই শব্দগুলোতে মুগ্ধ। আপনি হয়তো বলবেন, 'এটি আপনার সময়ের অনুভূতি', কিন্তু আমার সময়ের অনেক অন্য কবিতার সঙ্গে সংযুক্তি রয়েছে এবং সেগুলোতে এমন অনুভূতি তৈরি হয়নি। আচ্ছা, যদি আমি এই কথাটি মেনে নিই, তবে এই সত্তর বছরে লাখ লাখ পাঠক যাঁরা তাঁর

কবিতার জাদুতে মোহিত হয়েছেন তাঁদের ব্যাপারে কী বলা যায়!

সাঈদ নাফিসি বিশ্বাস করেন: যদি আমি ফারসি কবিতার ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিই, তবে দেখতে পাই যে, এখন পর্যন্ত ফারসি ভাষায় কবিতা লেখার জন্য কোনো নারীকে এতো গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এই গুরুত্বারোপ পুরোপুরি যৌক্তিক। কারণ, নিশ্চয়ই এখন পর্যন্ত কোনো নারী পারভীনের মতো এতো অসাধারণভাবে কবিতা লেখেননি।

**মানবতার কবি পারভীন এতেসামি**

পারভীন তাঁর কবিতায় স্বৈরাচারবিরোধী আলোচনার পাশাপাশি মানবতার মহৎ গুণাবলিও উন্মোচন করেছেন। তিনি এমন একজন কবি যিনি সর্বকালের এবং সকল মানুষের জন্য কথা বলেছেন। পারভীন এতেসামি তাঁর কবিতায় মানুষের আচার-আচরণ, কথাবার্তা ও চিন্তা-ভাবনার চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি সর্বোত্তম উপায়ে এবং ভিন্ন রূপে মানবতার কথা বলেন যা সকল মানুষের মধ্যে বিদ্যমান থাকা উচিত। পৃথিবীতে অনেক মানুষ এসেছে এবং আসবে। অনেকেই নিন্দনীয় কাজগুলো মধ্যে, যেমন লোভ-লালসা, অন্যের সম্পদ লুট করা, অন্যকে অসম্মান করা, নির্যাতন করায় নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। তারা জীবনে সুখী হওয়ার চিন্তা করে। কিন্তু পারভীনের দৃষ্টিতে জীবন হলো আত্মাকে সাজানো এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো মানুষের আত্মা। পারভীন বলেন :

**পারভীন তাঁর কবিতায় নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, প্রকৃতির প্রতি প্রেম, জীবজন্তুর প্রতি প্রেম, সমাজে এতিমদের অবস্থা, নারীর সামাজিক কার্যক্রম, নারীশিক্ষার গুরুত্ব, গরীবদের প্রতি সহানুভূতি, অসহায় মানুষকে সহযোগিতা, নৈতিকতার শিক্ষা এবং সত্যের আহ্বান করেছেন।**

چو تن رسواست، عیبش را چه پوشم
چو بی پرواست، در کارش چه کوشم
شکستیمش که جان مغزست و تن پوست
کسی کاین رمز داند اوستاد اوست

যখন শরীর অপমানিত, তার দোষ কিভাবে ঢেকে রাখতে পারি?
যখন সে উদাসীন, তার কাজে আমি কি করতে পারি?
আমরা তাকে ভেঙে দিয়েছি, কারণ প্রাণ হলো মস্তিষ্ক আর দেহ হলো খোসা।
যিনি এই রহস্য জানেন তিনিই হচ্ছেন তার গুরু।

পারভীনের দৃষ্টিতে সকলের মাঝে যে বিষয়টি অভিন্ন থাকা উচিত সেটি হলো মানবতা। যেমন, সময়ের অপচয় করা থেকে দূরে থাকা, সত্য, শুদ্ধতা, ধৈর্য, দয়া, অন্যকে সহযোগিতা করা এবং সন্তুষ্ট থাকা। পারভীনের অনেক কবিতা প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যকার আলোচনা ও তর্ক-বির্তক আকারে রচিত হয়েছে। তাঁর কবিতার মূল বিষয়বস্তু হলো সময় ও সুযোগের গুরুত্ব, নৈতিক উপদেশ, নিপীড়িত ও দুর্বলদের উপর নিপীড়নের সমালোচনা এবং দুনিয়ার অস্থায়িত্ব। ছোটবেলা থেকেই ধর্মীয় ও নৈতিক বই পড়তেন। পারভীন নারী, শিশু, দুঃস্থ ও অসহায়দের নিয়ে কবিতা লিখেছেন যার কারণে মানুষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে তাঁর কবিতা পড়া শুরু করে। ১৩১৪ হিজরি শামসিতে পারভীনের কাব্যগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় এবং এটি তাঁকে খ্যাতি এনে দেয়।

পারভীন তাঁর কবিতায় নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, প্রকৃতির প্রতি প্রেম, জীবজন্তুর প্রতি প্রেম, সমাজে এতিমদের অবস্থা, নারীর সামাজিক কার্যক্রম, নারীশিক্ষার গুরুত্ব, গরীবদের প্রতি সহানুভূতি, অসহায় মানুষকে সহযোগিতা, নৈতিকতার শিক্ষা এবং সত্যের আহ্বান করেছেন।

به سر خاک پدر، دخترکی
صورت و سینه بناخن میخست
که نه پیوند و نه مادر دارم
کاش روحم به پدر می‌پیوست

বাবার কবরের কাছে, ছোট্ট একটি মেয়ে
মুখে আর বুকে নখের আঘাত
না আছে সম্পর্ক, না আছে মা
আহ! আমার আত্মা যদি বাবার সাথে যুক্ত হতো।

এই মানবতার কবি তাঁর সাহিত্যকর্ম দ্বারা সাধারণ মানুষের প্রিয় কবি হয়ে গেলেন। তাঁর কবিতা শুধু ইরানেই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর অনেক বছর পরেও পাঠককুলের হৃদয়ে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন।

## জয়তুনের রক্তলাল শাখা

সাইয়্যেদ রেজা মীরমোহাম্মদী
কালচারাল কাউন্সেলর
ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস
ঢাকা, বাংলাদেশ

পয়গাম্বর মেরাজে
করছেন ক্রন্দন
আর মূসা মীকাতে
পেরেশান
ঈসা
পৃথিবীতে ফিরে আসার জন্য ব্যাকুল।
জল্লাদরা
ফিলিস্তিনবাসীর রক্তে জয়তুন গাছের ডালগুলোকে
টকটকে লাল বানিয়ে ফেলেছে
আরও একবার 'আমি তোমাদের সবচেয়ে বড় প্রভু',
দাবি তুলেছে ফেরাউন
শয়তান তার সভায় হাতে শরাব নিয়ে নাচছে;
ইবলিশ
যায়ন পাহাড়ের উপর নাচছে, তাণ্ডব নৃত্য করছে;
আর নববধূ গাজার
রক্তাক্ত বাসর ঘরে মৃত্যুর করুণ সুর বাজছে
মূসার চোখের আড়ালে
সামেরি আবার শহরে ফিরে এসেছে
আর সোনার বাছুরগুলো
রক্তাক্ত খুর দিয়ে
গাজার পথ চষে বেড়াচ্ছে
গাজা রক্তে নিমজ্জিত,
আর প্রাণের নবী মিরাজে উদ্বিগ্ন।
কিন্তু ঈসা
ইমাম মাহদীর সাথে
আবার ফিরে আসবেন
আর মূসার লাঠি
ফেরাউনের সেনাদের
নীলনদের ফাটলে
দাফন করবে।
সময়ের কাটা
টিকটিক করে জানান দিচ্ছে,
বলছে, ইমাম মাহদী আসছেন,
গাজার মায়েরা
দীর্ঘ রাতের অন্ধকারে
এতিম সন্তানদেরকে বুকে নিয়ে
ভোরের অপেক্ষায় আছেন।
আর নিঃসন্দেহে ভোর আসবেই।

## মুক্তির পতাকা ফিলিস্তিন

মাহমুদুল হাসান নিজামী

ফিলিস্তিন আমার ফিলিস্তিন
আমার গৌরবের আমার
ঐতিহ্যের সম্মান অমলিন
ফিলিস্তিন ফিলিস্তিন ফিলিস্তিন।
আমার প্রথম কেবলা
আমার বিশ্বাসের স্বরধ্বনি
আমার ইতিহাসের রাজধানী
নবী ইব্রাহিম সোলাইমান
দাউদ ঈসা মুসার স্মৃতি
স্মারক অনন্ত অমলিন
ফিলিস্তিন ফিলিস্তিন ফিলিস্তিন ।
ইয়াওমুল কিয়ামা আমার বিশ্বাসে
আমার ভালোবাসা প্রীতির পরিহাস
রক্তের বন্যায় অনন্ত আঘাত হায়েনার
লাখো শহীদের অরণ্য উদ্যান
নবীজি মুহাম্মদ মিরাজ
সিদরাতুল মুনতাহা সিড়ির জমিন
ফিলিস্তিন ফিলিস্তিন ফিলিস্তিন।
বারবার কবিতা হয়ে জেগে উঠে
অনন্ত কোন ইতিহাস
শহীদ ইসমাইল হানিয়া
রক্তে যে মাটি রঙ্গিন
ফিলিস্তিন ফিলিস্তিন ফিলিস্তিন।
নব আবাবিল জেগে ওঠে
যুগে যুগে সত্যের উন্মুক্ত উদ্ধারে
সারা দুনিয়ায় মুক্তির পতাকা উড্ডীন
ফিলিস্তিন ফিলিস্তিন ফিলিস্তিন।

## যোদ্ধা নারী
**ফাতেমা ইয়াসমিন**

আমি এক যোদ্ধা নারী
জন্মেছি যে মাটির বুকে
ফিলিস্তিনির ভূগর্ভে,
আঁখি মেলে দেখেছিলাম
প্রথম আলোকশিখা
কানে বাজে সহস্র কোটি
গোলাবর্ষণের আওয়াজ।।
জন্ম থেকে জ্বলছি আমি
পাথরে পাথরে ঘেঁষে
কখনো গর্তে, কখনো জঙ্গলে
কেটেছে আঁধার রাত্রি,
কখন জানি বড় হয়ে দেখি
যোদ্ধা নারীর হাত।।
মায়ের কোলে দেখেছি সেদিন
অস্ত্র চালানোর ধার
বাঘের থাবা কি করে বাঁচায়
নিজের আত্ম প্রাণ।।
নারী যখন গর্জে উঠে
হিংস্র ভরা চোখে
নিস্তার নাহি আজ
ফিলিস্তিনি নারীর হাতে
ইজরাইলের নরপশুর দল।

## ফিলিস্তিন যেন মৃত্যুপুরী
**মাহাতাব উদ্দিন**

ফিলিস্তিন যেন মৃত্যুপুরী
আগুন জ্বলছে লেলিহান।
কোলের শিশু পায়নি রক্ষা
গেল সহস্র প্রাণ।
সন্ত্রাসের পোড়া ছাই হতে
উঠলো হামাস জেগে
জাগো বিশ্বের মুসলিম জাতি
জাগো উল্কার বেগে।
মৃত্তিকার তল ছেদিয়া তাহাতে
সেনা চৌকি গড়ে
জায়নবাদীর আতঙ্ক তাহাতে
হামাস যদি ধরে।
কত বোমারু তালাস করিল
কত ট্যাংক গেল উড়ে
বিশ্বসেরা সৈন্য সেথায়
টিকিটাও নাহি ধরে।
রক্ত নিয়ে খেলছে হলি
জায়নবাদী সেনা
লক্ষ মুসলিম বাস্তুচ্যুত
শুধিতে হবে দেনা।
মা হারালো কোলের শিশু
ঝাঁঝরা বাবার বুক
ত্রাণ দাতারাও মরছে সেথা
মরেই যেন সুখ।
ইহুদির সাথে করো না দোস্তি
মহান রবের বাণী
চির শত্রু ইসলামের ওরা
পড় কোরআন খানি।

## রক্তাক্ত ফিলিস্তিন
**রেহেনা ইসলাম**

রক্তের নদী বইছে সদাই... রিক্ত ফিলিস্তিন
হাজার শিশুর কণ্ঠে বাজে প্রতিবাদের বীণ।
ধূলি, ধোঁয়া, আগুন পোড়া, তবু বাঁচার আশা
আঁধার নামে গুলির শব্দে রুদ্ধ মুখের ভাষা।
ভাঙা যে ঘর, মাটির গড়া স্মৃতিকাতর মেলা
মা-বাবা ও ভাইবোন এখন সবাই একেলা।
রক্তের নদী রয় না থেমে, বয় যে সবসময়,
মরুর বুকে কঠিন শপথ হবেই হবে জয়।
বিপ্লবেরই ঢেউয়ে ঢেউয়ে কান্না যাবে থেমে,
নতুন সূর্য উঠবে সেদিন, শান্তি আসবে নেমে।
পাথর, কাঁটা, সীমান্ত দিয়ে বেঁধে রাখে যারা
মুক্তির পথ আসবে যেদিন জাগবে সর্বহারা।
ফিলিস্তিন স্বাধীন হবে মুক্তির গানে গানে
খুশির বন্যা বয়ে যাবে সবার প্রাণে প্রাণে।

# বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনে ইরানের সাফল্য

সাইদুল ইসলাম

একটি দেশ তথা জাতির উন্নয়নের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে যে জাতি যত বেশি এগিয়ে সে জাতি তত উন্নত। বলা হয়ে থাকে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ কোনো জাতি যেকোনো সময় যে কোনো কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে সক্ষম। আর এ বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিয়েই ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতার নির্দেশে দেশটির বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদরা চরম আত্মত্যাগ ও সাধনার মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে চলেছেন। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিভিন্ন উন্নয়ন সূচকের

স্যাটেলাইট তৈরী এবং উৎক্ষেপণ করতে সক্ষম বিশ্বের শীর্ষ দশে ইরান

শক্তিশালী অবস্থান বলে দিচ্ছে দেশটি কতটা অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছে। শিক্ষা, বিজ্ঞান, উদ্ভাবন, প্রযুক্তিগত উন্নয়নসহ প্রায় সব ক্ষেত্রেই এখন নেতৃস্থানীয় দেশের তালিকায় রয়েছে ইরান। সম্প্রতি ইরানের প্রেসিডেন্ট কার্যালয়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর একটি বই প্রকাশ করেছে। বইটিতে ইসলামি বিপ্লবের পর বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইরানের সার্বিক উন্নয়নের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

বইটির নাম 'সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইন ইরান : এ ব্রিফ রিভিউ ২০২৪'। বইটিতে ২০২৩ সাল পর্যন্ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইরানের অর্জনগুলো পাঠকদের জন্য বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে।

বইটি শুরু করা হয়েছে ইরানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিহাস দিয়ে। এরপরেই বইটিতে বর্ণনা করা হয়েছে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনে ইরানের জাতীয় নীতি। বৈজ্ঞানিক প্রকাশনার দিক দিয়ে বিশ্বে ইরানের অবস্থান উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি দেশটির সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত পরিসংখ্যানের উপর একটি পর্যালোচনা তুলে ধরা হয়েছে। ইরানে ২০২২-২০২৩ সালে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মোট ২০ লাখ ৮৭ হাজার ৫২৪ জন শিক্ষার্থী পড়ালেখা করে। ইরানের নারী শিক্ষার্থীর হার ৫০ দশমিক ৫ শতাংশ ও পুরুষ শিক্ষার্থীর হার ৪৯ দশমিক ৫ শতাংশ।

**বৈশ্বিক উদ্ভাবন সূচক : দশকের দ্রুততম ক্রমবর্ধমান দেশ ইরান**

ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অর্গানাইজেশন (ডব্লিউআইপিও) প্রকাশিত বৈশ্বিক উদ্ভাবন সূচকে (জিআইআই) বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল দেশ ইরান। জ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনে ইরান ২০২৩ সালে ৫৫তম অবস্থানে ছিল। ৬ ধাপ উন্নতি করে ২০২৪ সালে দেশটি ৪৯তম স্থান লাভ করে। অন্যদিকে, ব্যবসায়িক পরিশীলতায় ২০২৩ সালের ১১৭তম অবস্থান থেকে উন্নতি করে ২০২৪ সালে দেশটি ১১০তম স্থান লাভ করে।

এছাড়াও, বাজার পরিশীলতা এবং অবকাঠামোতে ইরানের র‍্যাংকিং ২০২৩ সালে যথাক্রমে ১৯তম এবং ৯৭তম থেকে ২০২৪ সালে ১৭তম এবং ৯৫তম'তে উন্নীত হয়েছে। গ্লোবাল ইনোভেশন ইনডেক্স বিশ্বের নেতৃস্থানীয় দেশগুলোকে তাদের উদ্ভাবন সক্ষমতার উপর ভিত্তি করে তালিকা প্রকাশ করে।

চলতি বছরের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে ইরান দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। বৈশ্বিক উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তি সূচকগুলোর মধ্যে রয়েছে সৃজনশীল ফলাফল, জ্ঞান এবং প্রযুক্তির আউটপুট, মানব মূলধন ও গবেষণা এবং ব্যবসায়িক পরিশীলতার সূচক।

২০২৪ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত ইরানের জ্ঞানভিত্তিক কোম্পানির মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৯ হাজার ৫৫৯টিতে। এর মধ্যে স্টার্টআপের সংখ্যা ৬ হাজার ৭৭৯টি, প্রযুক্তি কোম্পানি ৭৯৫টি এবং উদ্ভাবন ফার্ম ১ হাজার ৯৮৫টি। ইরানে ২০১২ সালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পার্কের সংখ্যা ছিল ৩৩টি, ২০২৩ সালে সেটি বেড়ে দাঁড়ায় ৫৪টিতে। ২০১২ সালে ইনকিউবেটর ছিল ১৩১টি, ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে তা এসে দাঁড়ায় ২৯০টিতে। চলতি বছরের জানুয়ারি পর্যন্ত সৃজনশীল কোম্পানির সংখ্যা দাঁড়ায় ১ হাজার ৯১৪টিতে, উদ্ভাবন কেন্দ্রের সংখ্যা ৪১৯টি এবং এক্সিলারেটরের সংখ্যা ১৫৯টি। বর্তমানে ইরানের ৯৮ দশমিক ৫ শতাংশ গ্রামীণ

জনগোষ্ঠী ও শতভাগ নগরবাসী ইন্টারনেট সুবিধা উপভোগ করছে।

### বিশ্বের শীর্ষ ২ ভাগ আলোচিত গবেষকদের মধ্যে আড়াই হাজার ইরানি

বিশ্বের সর্বাধিক উদ্ধৃত বিজ্ঞানীদের শীর্ষ ২ শতাংশ গবেষকের মধ্যে স্থান পেয়েছেন ২ হাজার ৫০৩ জন ইরানি। এর আগে ২০২৩ সালে এই তালিকায় ইরান থেকে স্থান পান ১ হাজার ৮৭০ জন গবেষক। আগের বছরের তুলনায় এবার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে আলোচিত ইরানি গবেষকদের সংখ্যা। এলসেভিয়ারের সরবরাহ করা স্কোপাস ডেটা ব্যবহার করে বিশ্বের শীর্ষ গবেষকদের তালিকা প্রকাশ করেছে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি। শীর্ষ ১ লাখ বিজ্ঞানীর গবেষণা পর্যালোচনা করে সেরা গবেষকদের বাছাই করা হয়েছে। এদিকে, নেচার ইনডেক্স রিসার্চ লিডারস রিপোর্টের ২০২৪ পর্বে ইরানকে বিশ্বব্যাপী গবেষণা নেতাদের মধ্যে ৩২তম স্থান দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদনটি ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত প্রকৃতি সূচক ডেটার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে।

### ইসলামি দেশগুলোর মধ্যে জ্ঞানীয় বিজ্ঞানে শীর্ষ দুয়ে ইরান

ওয়েব অব সায়েন্সের তথ্য মতে, এক দশক ধরে (২০১৪ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত) ইরান ইসলামি দেশগুলোর মধ্যে জ্ঞানীয় বিজ্ঞানের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রথম বা দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। দেশটি যথাক্রমে ৩৮৭, ১৫৬ এবং ৩০টি নথি নিয়ে জ্ঞানীয় স্নায়ুবিজ্ঞান, জ্ঞানীয় পুনর্বাসন এবং জ্ঞানীয় ভাষাবিজ্ঞানে প্রথম স্থানে রয়েছে। ইরান জ্ঞানীয় মনোবিজ্ঞান (১২৪ নথি), জ্ঞানীয় শিক্ষা (৫৬১), মনের দর্শন (৩৪) এবং জ্ঞানীয় মূল্যায়নে (৮৯৮) দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। র‍্যাংকিংয়ে জ্ঞানীয় স্নায়ুবিজ্ঞানে ইরান সবচেয়ে ভালো অবস্থানে রয়েছে। জ্ঞানীয় বিজ্ঞানের এই ক্ষেত্রে দেশটি বিশ্বব্যাপী ১৫তম স্থানে রয়েছে। দেশের মধ্যে তেহরান ইউনিভার্সিটি অব মেডিক্যাল সায়েন্স ৭৩টি নথি, তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় ৩৯টি নথি এবং শহিদ বেহেশতি ইউনিভার্সিটি অব মেডিকেল সায়েন্স ৩২টি নথি নিয়ে জ্ঞানীয় নিউরোসায়েন্সে প্রথম থেকে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। জ্ঞানীয় মনোবিজ্ঞানে দেশের মধ্যে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়, মাশহাদের ফেরদৌসি বিশ্ববিদ্যালয় এবং আল্লামা তাবাতাবাঈ বিশ্ববিদ্যালয় শীর্ষ তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়। জ্ঞানীয় ভাষাবিজ্ঞানে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়, আল-জাহরা বিশ্ববিদ্যালয়, আল্লামা তাবাতাবাঈ বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম থেকে তৃতীয় স্থানে রয়েছে।

**ইরানের ভেষজ ও ঐতিহ্যবাহী ওষুধ বিভাগের সচিব মোহাম্মদ রেজা শামস আরদাকানি বলেছেন, ইরানি গবেষকরা ভেষজ ও ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা ক্ষেত্রে জ্ঞান উৎপাদনে বিশ্বে চতুর্থ স্থান অর্জন করেছে। তিনি বলেন, ২০০৭ সালে ভেষজ ও ঐতিহ্যবাহী ওষুধ অনুষদ গঠনের পর আমরা এ ক্ষেত্রে জ্ঞান অর্জন এবং গবেষণায় নিজেদের সামর্থ্য অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে প্রমাণ করেছি।**

### পানি বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে বিশ্বে চতুর্থ ইরান

ইসলামিক ওয়ার্ল্ড সায়েন্স সাইটেশন (আইএসসি) ইনস্টিটিউটের প্রধান আহমদ ফাজেলজাদে বলেছেন, পানি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে প্রকাশনার সংখ্যার দিক দিয়ে ইরান ইসলামিক দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষ স্থানে রয়েছে। তিনি বলেন, ওয়েব অব সায়েন্স ডাটাবেজ প্রকাশিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে, ইরান মাল্টি-স্টেজ ফ্ল্যাশ ডিস্টিলেশন, মাল্টি-ইফেক্ট ডিস্টিলেশন, স্টিম কম্প্রেশন ডিস্টিলেশন, রিভার্স অসমোসিস বা রিভার্স ব্যাপ্তিযোগ্যতা এবং মেমব্রেন ডিস্টিলেশনসহ পানি প্রযুক্তির অনেক ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় ইসলামিক দেশগুলোর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। ওয়েব অব সায়েন্সে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক নথির সংখ্যার নিরিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বলে জানান তিনি। ইরানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক ভাইস প্রেসিডেন্সির একজন কর্মকর্তা মোহাম্মদ হেম্মত জানান, ২০২২ সালে ইরান পানি প্রযুক্তিতে বিশ্বের চতুর্থ শীর্ষ দেশের স্থান লাভ করে।

### বিশ্বে জেনেটিক কিট উৎপাদনকারী শীর্ষ পাঁচ দেশের মধ্যে ইরান

নিষেধাজ্ঞা দিয়ে অত্যাধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তি অর্জনে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করা সত্ত্বেও দেশটি বিশ্বজুড়ে জেনেটিক কিট উৎপাদনকারী ৫টি দেশের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। ইরানের ফরেনসিক মেডিসিন অর্গানাইজেশনের ল্যাবরেটরি বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট মাসুদ কাদি-পাশা এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানান। বিবৃতিতে তিনি পশ্চিমের নিষ্ঠুর নিষেধাজ্ঞার দিকে ইঙ্গিত করেন। তিনি বলেন, নিষেধাজ্ঞা দিয়ে উচ্চ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ইরানকে জেনেটিক কিট আমদানিতে বাধা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু স্বনির্ভরতা লাভে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টা সফল হয়েছে।

### ইরানের কারিগরি-প্রকৌশল পরিষেবা রপ্তানিতে ইরানের সাফল্য

ইরানের কারিগরি-প্রকৌশল পরিষেবা রপ্তানি থেকে চলতি ইরানি ক্যালেন্ডার বছরের প্রথম সাত মাসে (মার্চ ২০ থেকে অক্টোবর ২১) আয় হয়েছে ৭০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান শুল্ক প্রশাসন (আইআরআই সিএ) এই তথ্য জানিয়েছে। ইরান পাওয়ার ইন্ডাস্ট্রি সিন্ডিকেটের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান পেয়াম বাকেরির তথ্যমতে, বিদেশে প্রযুক্তিগত ও প্রকৌশল সেবা রপ্তানির জন্য ইরানের ভালো সক্ষমতা রয়েছে, যা ইরানের অর্থনীতির ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ। বাকেরি মে মাসের শুরুতে বলেছিলেন, দেশের আট-শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য দেশীয় বা বিদেশী সব সক্ষমতা সর্বোত্তমভাবে ব্যবহার করা উচিত।

### ন্যানো প্রযুক্তিতে ইরানের অসাধারণ উত্থান

ন্যানো প্রযুক্তিতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে ইরান। দেশটির বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা এবং ন্যানো পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধি এই ক্ষেত্রে বিশ্ব নেতা হিসেবে ইরানের উত্থানকে প্রমাণ করেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইরানে যে শিল্পগুলো ভালো প্রবৃদ্ধির

অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তার মধ্যে একটি ন্যানো প্রযুক্তি শিল্প। এই শিল্প সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিশ্বের শীর্ষ পাঁচে রয়েছে ইরানের অবস্থান। শীর্ষস্থানীয় ন্যানোটেকনোলজি ওয়েবসাইট স্ট্যাটন্যানোর তথ্যমতে, ইরান ন্যানো প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দারুণ অগ্রগতি লাভ করেছে। ন্যানোপ্রযুক্তি প্রকাশনার ক্ষেত্রে দেশটি পঞ্চম স্থানে রয়েছে। এই র‍্যাংকিং ইরানের উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের প্রমাণ বহন করে। ইরান ন্যানোটেকনোলজি ইনোভেশন কাউন্সিলের সেক্রেটারি এমাদ আহমাদভান্দ বলেছেন, গত ফারসি বছরে দেশটির ন্যানো-পণ্য রপ্তানি আগের বছরের তুলনায় ১১০ শতাংশ বেড়েছে। আইআরআইবি-র এক প্রতিবেদনে বলা হয়, আহমাদভান্দ জানান, ইরানের উৎপাদকরা উল্লিখিত বছরে ১৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ন্যানো প্রযুক্তি পণ্য রপ্তানি করেছে। এর আগের বছর ২১ মার্চ ২০২২ থেকে ২১ মার্চ ২০২৩ এর মধ্যে দেশটি ৬৯ মিলিয়ন ডলার মূল্যের ন্যানো প্রযুক্তি পণ্য রপ্তানি করে।

ইরানি এই কর্মকর্তা বলেন, আগের বছরে ইরানের ন্যানো-পণ্যের মোট মূল্য ছিল ১ দশমিক ৬২ বিলিয়ন ডলার। ন্যানো প্রযুক্তি খাত ইরানে সাফল্যের একটি প্রধান উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষজ্ঞ ও প্রোগ্রাম-ভিত্তিক মানবসম্পদ নিয়ে গঠিত এই অঙ্গনটি উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে। দেশের উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি বাস্তুতন্ত্রে রত্নের মতো জ্বলজ্বল করছে খাতটি।

আইসিইউ ভেন্টিলেটর, ফেস মাস্ক ও লেজার থার্মোমিটার, গৃহস্থালির যন্ত্রপাতি, গাড়ি, ওষুধ ও চিকিৎসা সামগ্রী, টেক্সটাইল, এয়ার পিউরিফায়ার, ক্যাটালিস্ট, পাওয়ার প্ল্যান্ট ফিল্টার, তেল কূপ খননের সরঞ্জাম, ভাল্ভ এবং পাইপ ফিটিং, পানি জীবাণুনাশক এবং জলরোধী আবরণ দেশীয় ন্যানোটেকনোলজি কোম্পানির উৎপাদিত পণ্যগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

**মহাকাশবিজ্ঞানে মধ্যপ্রাচ্যে শীর্ষে ইরান**

মহাকাশবিজ্ঞানে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইরান নজরকাড়া সাফল্য অর্জন করেছে। ইরানের মহাকাশ গবেষণা সংস্থার তথ্য অনুযায়ী এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে মহাকাশবিজ্ঞানে র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষে রয়েছে ইরান। মহাকাশবিজ্ঞানে ইরানের সাফল্য তুলে ধরে দেশটির মহাকাশ সংস্থার (আইএসএ) প্রধান হাসান সালারি বলেন, দেশীয়ভাবে তৈরি ১৪টি স্যাটেলাইট অদূর ভবিষ্যতে উৎক্ষেপণের জন্য তাঁর দেশ প্রস্তুত করেছে। এছাড়া অন্যান্য আরও ৩০টি স্যাটেলাইট বিভিন্ন উদ্দেশ্যে তৈরি করা হচ্ছে বলে জানান তিনি। বার্তা সংস্থা ইরনা সালারিহের বরাত দিয়ে বলেছে, এই ৩০টি উপগ্রহের মধ্যে ২০টি নির্মাণ করছে বেসরকারি খাত। এই কর্মকর্তা আরও জানান, ২০২১ সালে প্রয়াত প্রেসিডেন্ট ইবরাহিম রাইসির প্রশাসনের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে ১২টি স্যাটেলাইট সফলভাবে কক্ষপথে স্থাপন করা হয়। আইএসএ বেসরকারি খাতের সাথে যৌথ প্রকল্প স্থাপন করায় দেশীয় স্যাটেলাইট ডিজাইন এবং তৈরির গতি ত্বরান্বিত হয়েছে। স্যাটেলাইট তৈরি এবং উৎক্ষেপণ করতে সক্ষম বিশ্বের শীর্ষ ১০টি দেশের মধ্যে রয়েছে ইরান। সম্প্রতি দেশটি কাওসার ও হুদহুদ উপগ্রহ দুটি মহাকাশে উৎক্ষেপণ করেছে। পৃথিবীর ৫০০ কিলোমিটার কক্ষপথে সফলভাবে এটি স্থাপন করা হয়। সূত্র জানিয়েছে, দেশীয়ভাবে তৈরি ইরানের এই উপগ্রহ দুটি সংকেত পাঠানো শুরু করেছে। এতে বোঝা যাচ্ছে, উপগ্রহ দুটি নিখুঁত অবস্থায় কক্ষপথে সঠিকভাবে পরিক্রমণ করছে। এর আগে চলতি বছরের শুরুর দিকে ইরান সফলভাবে মাহদা গবেষণা স্যাটেলাইট, দুটি গবেষণা কার্গোসহ অভ্যন্তরীণভাবে তৈরি উন্নত সিমোর্গ (ফিনিক্স) স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ যান (এসএলভি) মহাকাশে পাঠিয়েছে।

ইরানের মহাকাশ সংস্থার প্রধান হাসান সালারি বলেছেন, চলতি বছরের শেষ নাগাদ ইরান 'তোলু-৩' এবং 'জাফর-২' নামে আরো দুটি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করবে। এর আগে সেপ্টেম্বরে ইরানের মহাকাশ সংস্থার প্রধান ঘোষণা দিয়েছিলেন, চলতি ১৪০৩ সালের শেষ নাগাদ ইরান ৫-৭টি স্যাটেলাইট মহাকাশে পাঠানোর প্রস্তুতি

ইরানের স্যাটেলাইট ক্যারিয়ার সিমোর্গ

নিয়েছে। হাসান সালারি বলেন, ইরানি মহাকাশ সংস্থা ১৪০৩ সালে ইসলামিক বিপ্লবী গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) এরোস্পেস ফোর্সের সহযোগিতায় সাব-অরবিটাল উৎক্ষেপণের পরিকল্পনা করছে।

গত ফারসি বছরে ইরানের সর্বোচ্চ মহাকাশ পরিষদে মহাকাশ শিল্পের ১০ সালা পরিকল্পনা পাস হয়েছে। এছাড়া, মহাকাশ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ইরানের সহযোগিতা বেড়েছে গত বছর। চাবাহার এলাকায় ইরানের সর্ববৃহৎ মহাকাশ কেন্দ্র নির্মাণের কাজও শুরু হয়েছে। শহীদ সোলাইমানি স্যাটেলাইট সিস্টেমের নির্মাণ কাজও পুরোদমে এগিয়ে চলেছে।

গত বছরের সেপ্টেম্বরে পৃথিবীর কক্ষপথে নুর-৩ ইমেজিং স্যাটেলাইট স্থাপন করা হয়। কাসেদ নামক রকেটের মাধ্যমে এই উপগ্রহ মহাকাশে পাঠানো হয় এবং তা ভূপৃষ্ঠের ৪৫০ কিলোমিটার উপরে পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করা হয়। পৃথিবীর কক্ষপথে অবস্থান করে এই স্যাটেলাইট পরিমাপ ও নজরদারি মিশন পরিচালনা করছে। নূর-থ্রি স্যাটেলাইট প্রতি সেকেন্ডে ৭.৬ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেয় এবং মাত্র ৮ মিনিট ৩৩ সেকেন্ডে তা পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপিত হয়। ইরান সফলভাবে নতুন বায়ো

-স্পেস ক্যাপসুলও মহাকাশে পাঠিয়েছে। নিজেদের তৈরি লঞ্চার 'সালমান' এর সাহায্যে এটি পাঠানো হয়েছে। ইরানের বিজ্ঞান, গবেষণা ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অ্যারোস্পেস রিসার্চ ইনস্টিটিউট ৫০০ কিলোগ্রাম ওজনের এই ক্যাপসুলটি নির্মাণ করেছে। এটিকে ভূপৃষ্ঠ থেকে ১৩০ কিলোমিটার উচ্চতায় পাঠাতে ব্যবহার করা হয়েছে 'সালমান' লঞ্চার। ক্যাপসুল ও লঞ্চার উভয়ই তৈরি করেছেন ইরানি বিজ্ঞানীরা। মহাশূন্যে মানুষ পাঠানোর প্রস্তুতি হিসেবে বায়ো-স্পেস ক্যাপসুল উৎক্ষেপণ করা হয়। মহাকাশে মানুষ বা জীবন্ত প্রাণী আনা-নেওয়ার কাজে বায়ো-স্পেস ক্যাপসুল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ২০১০ সালে ইরান 'কাভেশগার' বা এক্সপ্লোরার নামক ক্যারিয়ার ব্যবহার করে মহাকাশে জীবন্ত প্রাণীসহ প্রথম বায়ো-ক্যাপসুল পাঠায়। এরপর এ সংক্রান্ত তৎপরতায় কিছুটা ভাটা পড়েছিল। বায়ো-ক্যাপসুল পাঠানোর মাধ্যমে এ ক্ষেত্রে অগ্রগতির প্রমাণ পাওয়া যায়। তেহরান শিগগিরই নতুন প্রজন্মের বায়ো-ক্যাপসুলগুলোর সাব-অরবিটাল পরীক্ষা চালাবে। ইরান যে বায়ো ক্যাপসুলটি পাঠিয়েছে তা একজন মানুষকে বহন করার ক্ষমতা রাখে। গত জানুয়ারিতে ইরান স্যাটেলাইট বহনকারী রকেট কায়েম-১০০ এর সাহায্যে সুরাইয়া নামক একটি স্যাটেলাইট ভূপৃষ্ঠ থেকে ৭৫০ কিলোমিটার উপরে পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করতে সক্ষম হয়। এই স্যাটেলাইটটি এখন পর্যন্ত ইরানের উৎক্ষেপণ করা স্যাটেলাইটগুলোর মধ্যে মহাকাশে সবচেয়ে বেশি উচ্চতায় পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে। ইরানের স্যাটেলাইট বহনকারী রকেট কায়েম-১০০ হচ্ছে তিন ধাপের সলিড ফুয়েল পরিচালিত রকেট, যা ১০০ কেজি পর্যন্ত ওজন বহন করতে পারে এবং তৃতীয় পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণে কক্ষপথে আনুমানিক ৫০ কেজি ওজনের সুরাইয়া স্যাটেলাইটকে ভূপৃষ্ঠ থেকে ৭৫০ কিলোমিটার উপরে স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। এই সফল উৎক্ষেপণকে মহাকাশে আরও বেশি উচ্চতায় ইরানের স্যাটেলাইট স্থাপনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে বড় ধরনের অগ্রগতি হিসেবে দেখা হচ্ছে।

### ক্ষেপণাস্ত্র তৈরিতে ইরানের সাফল্য

ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণ প্রযুক্তিতে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ দেশ ইরান। দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রগুলো শত্রুর লক্ষ্যবস্তুতে নিখুঁতভাবে আঘাত করতে সক্ষম। সম্প্রতি ইসরাইলে ইরানের দুই দফা হামলায় তার প্রমাণ মেলেছে। গেল এপ্রিলে ইরানের 'অপারেশন ট্রু প্রমিজ-১' এ ব্যবহৃত ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র পুরোপুরিভাবে প্রতিরোধে ব্যর্থ হয় ইসরাইলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আয়রন ডোম। অপরদিকে গত অক্টোবরে 'অপারেশন ট্রু প্রমিজ ২' এ ব্যবহৃত ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ও হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্রের বিরুদ্ধে ইহুদিবাদী ও তাদের সমর্থকদের প্রতিরক্ষা প্রচেষ্টা খুবই অকার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। ইরান অধিকৃত ফিলিস্তিনে আক্রমণের বিরুদ্ধে ১ অক্টোবর রাতে দেশে তৈরি প্রায় ২০০ ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে ইসরাইলে প্রতিশোধমূলক হামলা চালায়। ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) দাবি করেছে, তাদের নিক্ষেপ করা ৯০ শতাংশ মিসাইল লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনেছে।

### এক নজরে ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর প্রদর্শিত ক্ষেপণাস্ত্র

চলতি বছর ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর বিমান প্রতিরক্ষা ইউনিটের ক্ষেপণাস্ত্র প্রদর্শন ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রতিরক্ষা ও সামরিক শক্তির একটি অংশকে চিত্রিত করেছে। ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে ফাত্তাহ, খাইবার শেকান, হজ কাসিম, কদর, ইমাদ, খোররামশাহর, সাজিল এবং জিহাদ ক্ষেপণাস্ত্র।

### ফাত্তাহ

ফাত্তাহ-২ ইরানের তৈরি হাইপারসনিক মিসাইলের একটি নতুন সংস্করণ। এটি হাইপারসনিক গ্লাইড ভেহিকল (এইচজিভি) এবং হাইপারসনিক ক্রুজ মিসাইলের (এইচসিএম) সমন্বয়ে তৈরি।

মহাকাশে মানুষ বা জীবন্ত প্রাণী বহনের কাজে ব্যবহৃত ইরানের বায়ো ক্যাপসুল

ভবিষ্যতে এর আরও সংস্করণ তৈরি হবে বলে ধারণা। ফাত্তাহ-২ হাইপারসনিক ক্রুজ মিসাইলটির পাল্লা ১৪০০ কিলোমিটার। এটির ডিজাইন এমনভাবে করা যে, সহজেই এটি শনাক্ত করা সম্ভব না। ফলে শত্রুদের চোখ ফাঁকি দিয়েই আঘাত হানতে সক্ষম।

### খাইবার শেকান ক্ষেপণাস্ত্র

মাঝারি-পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র খাইবার শেকানের পরিচালনায় রয়েছে ইসলামি বিপ্লবী গার্ড কোরের অ্যারোস্পেস ডিভিশন। ২০২২ সালে এটি উন্মোচন করা হয়। এটি কঠিন জ্বালানি ব্যবহার করে। এর পাল্লা ১৪০০ কিলোমিটার। খাইবার শেকানকে নতুন প্রজন্মের এবং ক্ষেপণাস্ত্রের উন্নয়নের রূপান্তর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। খাইবার শেকান ক্ষেপণাস্ত্রের আলাদা বিস্তৃত লঞ্চার ব্যবহারের ক্ষমতা রয়েছে। এর জন্য ব্যবহৃত লঞ্চারটি ছদ্মবেশ ধারণ করে শত্রুদের চোখ ফাঁকি দিতে পারে।

### হজ কাসেম ক্ষেপণাস্ত্র

বিশ্বখ্যাত ইরানি জেনারেল শহিদ কাসেম সোলাইমানির নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়েছে। ২০২০ সালের আগস্ট থেকে এটি ইরানের প্রতিরক্ষা বাহিনীর কাছে রয়েছে। হজ কাসেম

ইরানের তৈরি মাঝারি-পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র। এর রেঞ্জ ১৫০০ থেকে ১৮০০ কিলোমিটার। হজ কাসেম ক্ষেপণাস্ত্রটিকে ফতেহ-১১০ এর নতুন প্রজন্ম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে গিয়ে আঘাত হানার ক্ষমতা রয়েছে এটির। এটিকে সহজেই শনাক্ত করা যায় না, ফলে শত্রুর চোখ ফাঁকি দিয়ে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করতে সক্ষম।

**কদর ক্ষেপণাস্ত্র**

এই ক্ষেপণাস্ত্রটি বিশ্বের দ্রুততম ক্ষেপণাস্ত্রগুলোর মধ্যে একটি এবং এটি প্রায় ৬ ম্যাক স্কেলের গতিতে গন্তব্যে পৌঁছতে পারে। অর্থাৎ এর গতি ঘন্টায় ৬ হাজার কিলোমিটারের বেশি।

**ইমাদ ক্ষেপণাস্ত্র**

এটি একটি মাঝারি-পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র যার বিস্ফোরণের মুহূর্ত পর্যন্ত নির্দেশিত থাকে এবং নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রয়েছে। ইমাদের পাল্লা প্রায় ১৭০০ কিলোমিটার।

**খোররামশাহর ক্ষেপণাস্ত্র**

ইরানের তৈরী নয়া আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

এটি একটি তরল জ্বালানি ক্ষেপণাস্ত্র যার পাল্লা ২০০০ কিমি এবং এটি ১৫০০ কেজি ওয়ারহেড ক্ষমতা বহনে সক্ষম।

**রাডার ফাঁকি দিতে সক্ষম দূর পাল্লার ড্রোন তৈরিতে ইরানের সাফল্য**

হালকা ও রাডার ফাঁকি দিতে সক্ষম দূরপাল্লার ড্রোন তৈরিতে ইরানের সাফল্য চোখে পড়ার মতো। এসব ড্রোনের সর্বোচ্চ ১০ হাজার ফুট উঁচু দিয়ে ওড়ার সক্ষমতা রয়েছে। ইরানের সেনাবাহিনীর একটি সূত্র জানিয়েছে, ইরানের পাইলটবিহীন বিমান বা ড্রোনের সক্ষমতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ইরানের এসব ড্রোন শত্রুর কৌশলগত ও দূরবর্তী লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম । রাডার ফাঁকি দিতে সক্ষম এই ড্রোনগুলো অনেক নিচ দিয়েও উড়ে যেতে পারে এবং স্থির বা চলমান লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে পারে।

এছাড়া অন্ধকারে ছবি তুলতে সক্ষম ড্রোন, অগ্নিনির্বাপক ড্রোন, পার্সেল ডেলিভারির ড্রোনসহ নানা ধরনের বেসামরিক কাজে ব্যবহৃত ড্রোন তৈরিতে ইরান নজরকাড়া সাফল্য পেয়েছে।

**প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ইরানের সাফল্য**

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ইরানের সেনাবাহিনীর এয়ার ডিফেন্স ফোর্সের ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর মোহাম্মদ খোশগালব বলেছেন, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের বৈচিত্র্যময় এবং বড় ধরনের হুমকি মোকাবেলায় বিভিন্ন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে। তিনি বলেন, বিমান প্রতিরক্ষা শক্তি উৎপাদনের মাধ্যমে কর্তৃত্ব তৈরি করে এবং এই কর্তৃত্ব শত্রুর হুমকির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গঠনের দিকে পরিচালিত করে। খোশগালব বলেন, বিমান প্রতিরক্ষা বাহিনীর সরঞ্জামগুলোর একটি বড় অংশ দেশীয়ভাবে নির্মিত হয়। তিনি বলেন, শত্রুর আক্রমণ শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে আমাদের খুব অনুকূল পরিস্থিতি রয়েছে। রাডার ও সনাক্তকরণ ব্যবস্থার বিষয়ে আমরা বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড এবং বিভিন্ন রেঞ্জে রাডার ব্যবহার করি এবং শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে আমাদের সর্বাধিক নির্ভুলতা এবং সর্বনিম্ন ত্রুটি রয়েছে।

**চিকিৎসাবিজ্ঞানে ইরানের সাফল্য**

ইসলামি বিপ্লবের পর গত সাড়ে চার দশকে ইরান চিকিৎসাবিজ্ঞানে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। বিপ্লবের আগে যে দেশটির অনেক শহরে ইরানি ডাক্তার খুঁজে পাওয়া দুরূহ ব্যাপার ছিল সেই ইরানের নাম এখন চিকিৎসাবিজ্ঞানে বিশ্বের শীর্ষ দেশগুলোর তালিকায়। ওষুধ উৎপাদন এবং ক্যান্সারসহ বিভিন্ন জটিল রোগের চিকিৎসায় ইরানের সাফল্য আজ চোখে পড়ার মতো। ইরানের প্রয়োজনীয় ওষুধের প্রায় ৯৯ শতাংশই দেশীয় কোম্পানিগুলো উৎপাদন করছে। ইরান এখন অঞ্চলের অন্যতম সফল ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে। সম্প্রতি ইরানের একটি জ্ঞানভিত্তিক কোম্পানি পাঁচটি মহাদেশের ৫০টি দেশে ১৭ হাজারের অধিক উন্নত চিকিৎসা ডিভাইস রপ্তানি ও ইনস্টল করেছে। রোগীর অত্যাবশ্যক লক্ষণ মনিটর, উন্নত আইসিইউ ভেন্টিলেটর, ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাফ, এইডি ডিফিব্রিলেটর এবং সাকশন ডিভাইস সহ উন্নত চিকিৎসা সরঞ্জামের নকশা ও উৎপাদনে কোম্পানিটির বিশেষত্ব রয়েছে।

**ভেষজ এবং ঐতিহ্যবাহী ওষুধ উৎপাদনে ইরান বিশ্বে চতুর্থ**

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের ভেষজ ও ঐতিহ্যবাহী ওষুধ বিভাগের সচিব মোহাম্মদ রেজা শামস আরদাকানি বলেছেন, ইরানি গবেষকরা ভেষজ ও ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা ক্ষেত্রে জ্ঞান উৎপাদনে বিশ্বে চতুর্থ স্থান অর্জন করেছে। ভেষজ ও ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহারে ইরানের কয়েক হাজার বছরের রেকর্ডের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ২০০৭ সালে ভেষজ ও ঐতিহ্যবাহী ওষুধ অনুষদ গঠনের পর আমরা এ ক্ষেত্রে জ্ঞান অর্জন এবং গবেষণায় নিজেদের সামর্থ্য অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে প্রমাণ করেছি।

## গুরুতর স্ট্রোক চিকিৎসায় শীর্ষ দশ দেশের মধ্যে ইরান

গুরুতর স্ট্রোক চিকিৎসায় ইরান বিশ্বের দশটি সফল দেশের মধ্যে একটি। ন্যাশনাল ইরানি স্ট্রোক কমিটির সদস্য এহসান শরিফিপুর একথা বলেছেন। তিনি জানান, ইরানে মৃত্যুর দ্বিতীয় প্রধান কারণ স্ট্রোক। এটি বিশ্বের একটি বড় চ্যালেঞ্জ এবং বিশ্বব্যাপী শারীরিক অক্ষমতার অন্যতম প্রধান কারণ। স্ট্রোক ব্রেন অ্যাটাক নামেও পরিচিত। সাধারণত মস্তিষ্কের একটি অংশে রক্ত সরবরাহ ব্যাহত হলে এটি ঘটে থাকে। এই ক্ষেত্রে হয় ভেসেলগুলো ব্লক হয় বা সেগুলোর রক্তপাত হয়, উভয় ক্ষেত্রেই মস্তিষ্কের যে কোনো অংশে রক্ত প্রবাহ ব্যাহত হয়।

## পশ্চিম এশিয়ায় চক্ষু চিকিৎসায় প্রথম স্থানে ইরান

ইরান পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে চক্ষুবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রথম স্থানে রয়েছে এবং দেশটি এই ক্ষেত্রে বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত দেশগুলোর সাথে প্রতিযোগিতা করছে। ইরানের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের চক্ষুবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান ডা. মাহমুদ জাব্বারভান্দ বলেছেন, ইরান বছরে লক্ষাধিক মেডিকেল পর্যটককে স্বাগত জানাচ্ছে এবং কোনো ইরানি রোগীকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানো হয় না। তিনি বলেন, চক্ষুবিদ্যার ক্ষেত্রে গবেষণা ও গবেষণার সুযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ইরান বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর সাথে তুলনীয়।

## ইরানে ইনজেকশনযোগ্য অ্যান্টি-ক্যান্সার ওষুধ উন্মোচন

ইরানের একটি জ্ঞানভিত্তিক কোম্পানি ইনজেকশনযোগ্য একটি ওষুধ তৈরি করেছে। ওষুধটি বিস্তর পরিসরে ক্যান্সারের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। 'সাইক্লোফসফামাইড' নামের ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্যটি আলবোর্জ প্রদেশে অবস্থিত একটি ইরানি কোম্পানি উন্মোচন করেছে।

এদিকে, ফুসফুস ক্যান্সারের চিকিৎসায় একটি অ্যান্টিবডি তৈরির জন্য সিলিকন ভ্যালি ইন্টারন্যাশনাল ইনভেনশন ফেস্টিভাল (এসভিআইআইএফ) ২০২৪-এ প্রথম স্থান লাভ করেছেন ইরানি উদ্ভাবক মোস্তফা শামলুই।

## বেদনানাশক ক্রিম তৈরিতে ইরানের সাফল্য

বেদনানাশক ক্রিম তৈরি করেছেন ইরানের একদল গবেষক। দেশটির জ্ঞানভিত্তিক একটি কোম্পানির গবেষকরা জীবাণুবিরোধী উপাদান সংবলিত এই ক্রিম উৎপাদন করেছেন। এটা বাতগ্রস্ত রোগীরা ব্যবহার করতে পারবেন।

## ওষুধশিল্পের প্রযুক্তি রপ্তানিতে ইরানের সাফল্য

বিশ্বে ওষুধ শিল্পের বৃহত্তম প্রযুক্তি রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হতে যাচ্ছে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান। দেশটির সবচেয়ে বড় ওষুধ কোম্পানি সিন্নাজেন ফার্মাসিউটিক্যাল গ্রুপের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ড. হালেহ হামেদিফার এই তথ্য জানিয়েছেন।

তেহরান চেম্বার অব কমার্স, ইন্ডাস্ট্রিজ, মাইনস অ্যান্ড এগ্রিকালচার (টিসিসিআইএমএ) এর রিপ্রেজেনটেটিভ বোর্ডের এক বৈঠকে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি জানান, ইরানে প্রথম বারের মতো সিন্নাজেন ফার্মাসিউটিক্যাল গ্রুপ ওষুধ শিল্পের নেতৃস্থানীয় রপ্তানিকারক ফার্ম হিসেবে পরিচিত হতে যাচ্ছে।

## বিশ্বসেরা বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংকিংয়ে ইরানের অবস্থান

বেস্ট গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিংয়ের ২০২৪-২০২৫ সংস্করণে ৬৯টি ইরানি বিশ্ববিদ্যালয় স্থান পেয়েছে। বিশ্বের সেরা ২ হাজার ২৫০টি শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এসব ইরানি বিশ্ববিদ্যালয় স্থান পেয়েছে। আগের বছর ২০২৩ সালে দেশটি থেকে ৫২টি বিশ্ববিদ্যালয় তালিকায় স্থান পায়। ১০৪টি দেশের এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে ১৩টি সূচকের উপর ভিত্তি করে তালিকায় স্থান দেওয়া হয়েছে। অ্যাকাডেমিক গবেষণা কর্মক্ষমতা, বৈশ্বিক এবং আঞ্চলিক খ্যাতি পরিমাপ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে মূল্যায়ন করা হয়। এতে শিক্ষার্থীদের নিজ দেশের সীমানার বাইরে বিদ্যমান উচ্চ শিক্ষার বিকল্পগুলি অন্বেষণ এবং বিদ্যালয়ের গবেষণার মূল দিকগুলির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়। বেস্ট গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিংয়ে ইরানের ১ম থেকে ৫ম স্থানে রয়েছে যথাক্রমে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় (বৈশ্বিক র‍্যাংকিং ২৭৫), ইসলামিক আজাদ বিশ্ববিদ্যালয় (৩৭৪), শরিফ ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি এবং তেহরান ইউনিভার্সিটি অব মেডিক্যাল সায়েন্স (৫১৬), তাবরিজ বিশ্ববিদ্যালয় (৫২১) এবং আমিরকবির ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি (৬৪৯)।

বেস্ট গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিংয়ে ইরানের ৬৯ বিশ্ববিদ্যালয়

## বিশ্ব দক্ষতা প্রতিযোগিতায় ইরানি শিক্ষার্থীদের ৯ পদক

ইরান থেকে মোট ১৮ জন ছাত্র ৪৭তম বিশ্ব দক্ষতা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে একটি রৌপ্যপদকসহ মোট ৯টি পদক জিতেছে। প্রতিযোগিতাটি ১০ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর ফ্রান্সের লিওনে অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বের ৬৫টির অধিক দেশ এবং অঞ্চল থেকে প্রায় দেড় হাজার প্রতিযোগী বিভিন্ন দক্ষতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

### বিশ্ব অলিম্পিয়াডে তৃতীয় শীর্ষ দেশ ইরান

২০২৪ সালে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াডে অংশ নিয়ে ইরানি শিক্ষার্থীরা ১০টি স্বর্ণপদক, ১০টি রৌপ্যপদক এবং দুটি ব্রোঞ্জপদক জিতে পদক তালিকায় বিশ্বব্যাপী তৃতীয় স্থানে রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও চীন যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়া এবং ভারত উভয়ই চতুর্থ স্থানে রয়েছে। এবছর ইরানি শিক্ষার্থীরা ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিয়াড ইন ইনফরমেটিক্স (আইওআই), জ্যোতির্বিদ্যা এবং জ্যোতিঃপদার্থবিদ্যার উপর আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াড, আন্তর্জাতিক পদার্থবিদ্যা অলিম্পিয়াড (আইপিএইচও), আন্তর্জাতিক রসায়ন অলিম্পিয়াড (আইসিএইচও), আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াড (আইএমও) এবং আন্তর্জাতিক জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে (আইবিও) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ইরানি ছাত্ররা ৩৬তম আইওআই-এ একটি স্বর্ণপদক, দুটি রৌপ্যপদক এবং একটি ব্রোঞ্জপদক জিতেছে। এতে ৯৬টি দেশের মধ্যে ৯ম স্থান লাভ করে তারা। ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরো রাজ্যের ভাসুরাসে ১৭ থেকে ২৭ আগস্ট অনুষ্ঠিত ১৭তম আইওএএ-তে ইরানি শিক্ষার্থীরা প্রথম স্থান অধিকার করে পাঁচটি স্বর্ণপদক জিতেছে।

### বিশ্বের শীর্ষ পরমাণু প্রযুক্তিধর দেশগুলোর অন্যতম ইরান

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের আণবিক শক্তি সংস্থা বা এইওআই-এর প্রধান মোহাম্মদ এসলামি বলেছেন, তাঁর দেশ সফলতার সাথে বিশ্বের শীর্ষ পরমাণু প্রযুক্তিধর দেশগুলোর কাতারে পৌঁছেছে। এজন্য তিনি ইরানের তরুণ বিজ্ঞানী ও গবেষকদের বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান।

সম্প্রতি শিরাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও অধ্যাপকদের সাথে এক বৈঠকে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, ইরান পরমাণু বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিতে অনেক অগ্রগতি লাভ করেছে। ইরানের পরমাণু সংস্থার প্রধান বলেন, 'এখন আমরা নকশা ও নির্মাণ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত কম্পিউটিং কোড এবং সফ্টওয়্যার পেতে সফল হয়েছি। এই কোডগুলো পারমাণবিক পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।'

### ২০ হাজার মেগাওয়াটের ৫টি পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করছে ইরান

২০৪১ সালের মধ্যে ২০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ইরান পাঁচটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রাথমিক কাজ শুরু করেছে। পারমাণবিক সুবিধার উন্নয়নে একটি ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠকে ইরানের প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট এই তথ্য জানান। এসময় তিনি এই প্রকল্পের জন্য একটি অর্থায়ন মডেল নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য সরকারের দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেন। ইরানের এই ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেন, 'পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পটি প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞানকে উন্নত করে দেশকে সামনের দিকে ধাবিত করবে। ফলে আমরা নির্মাণ এবং প্রকৌশলের সকল পর্যায়ে ধীরে ধীরে স্বয়ংসম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যেতে পারব।'

জ্ঞান-বিজ্ঞানের আরো অনেক শাখায় ইরান একের পর এক সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে চলেছে। একটিমাত্র লেখার মধ্যে এসব সাফল্যের সম্পূর্ণ তথ্য তুলে ধরা সম্ভব নয়। তবে এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে ইরানের সফলতার এই ধারা অব্যাহত থাকলে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে দেশটি এক্ষেত্রে বিশ্বের শীর্ষ কয়েকটি দেশের মাঝে স্থান করে নেবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

ইরানের সর্বোচ্চ নেতা হযরত আয়াতুল্লাহিল উজমা খামেনেয়ী বলেছেন, বিপ্লবের পর অর্থনৈতিকসহ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও অবকাঠামো ক্ষেত্রে উন্নয়নের যে ধারা সূচীত হয়েছে তার দীর্ঘমেয়াদি ফল এখন আমরা প্রতিনিয়ত দেখতে পাচ্ছি। হাজার হাজার গবেষণা কেন্দ্র, হাজার হাজার অবকাঠামো নির্মাণ, যোগাযোগ, শিল্প, জ্বালানি, খনিজ, স্বাস্থ্য, কৃষি, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নয়ন ছাড়াও পরমাণু জ্বালানি চক্র, মৌলিক কোষ নিয়ে গবেষণা, ন্যানো প্রযুক্তি, তেল-বহির্ভূত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি, প্রতিরক্ষা শিল্পের উন্নয়ন প্রভৃতি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের অগ্রগতিরই ফসল।

বিশ্ব অলিম্পিয়াডে তৃতীয় শীর্ষ দেশ ইরান

# ইরান : চলচ্চিত্র দুনিয়ার টেস্ট অফ চেরি!

ড. মুমিত আল রশিদ

চলচ্চিত্র দুনিয়ায় ইরান একটি অভূতপূর্ব বিস্ময়। অধিকাংশ মানুষ মনে করতেন ইরান যেহেতু রক্ষণশীল দেশ, খুব স্বভাবতই ইরানের নারীরা পর্দাপ্রথার তলে চাপা পড়ে এবং জনসাধারণ কঠোর নিয়মের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে অনেক কর্মক্ষেত্রের ন্যায় চলচ্চিত্র জগৎ থেকেও শত-সহস্র গুণ পিছিয়ে থাকবে। কিন্তু অভাবনীয় বিষয় হচ্ছে, সিনেমায় কল্পনার এই জগতকে তুচ্ছ করে ইরান এগিয়েছে বীর বিক্রমে। রক্ষণশীল মানেই কিন্তু গোঁড়ামি, কুসংস্কার আর একরোখা মনোভাব নয়; ফলে নতুন ধারার চলচ্চিত্র নির্মাণপর্ব উত্থানের সাথে সাথে বর্তমান ইরানে রেকর্ডসংখ্যক ফিল্ম স্কুল গ্র্যাজুয়েট বের হচ্ছে। ইরানি চলচ্চিত্রের কাহিনীবিন্যাস চলচ্চিত্রবোদ্ধাদের নিয়মিত ভাবাতে বাধ্য করছে। বিশ্বের দেশে দেশে নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইরানি চলচ্চিত্র নিয়ে পাঠ্যক্রম চালু হয়েছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। একসময় বিটিভিতে শুক্রবার বিকেলে প্রচারিত ইরানি চলচ্চিত্র দেখে ইরানি চলচ্চিত্রের ভক্ত বনে যাওয়া দর্শকের সংখ্যা এদেশে নেহাত কম নয়! ইরানের বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার মাজিদ মাজিদি এদেশে পরিচিত তাঁর বিখ্যাত 'চিলড্রেন অফ হ্যাভেন' চলচ্চিত্রের মাধ্যমে অথবা কিয়ারোস্তামি পরিচিত 'টেস্ট অফ চেরি'র স্বাদে আচ্ছন্ন হয়ে। বাংলাদেশের অগণিত দর্শক ও সিনেমাবোদ্ধা চলচ্চিত্রটি একাধিকবার উপভোগ করেছেন।

সমাজের নানা অসঙ্গতি তুলে ধরার ক্ষেত্রে শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে শিল্প সমালোচকদের নিকট ইরানি সিনেমা ইতোমধ্যে বিশেষ জায়গা দখল করে নিয়েছে। অবাক করা বিষয় হচ্ছে, রক্ষণশীল ও ধর্মীয় বিধিনিষেধের আবরণে থেকেও ইরানি চলচ্চিত্র বর্তমান সমাজের বাস্তব চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম হচ্ছে। মূলত এ কারণেই ইরানি সিনেমা শিল্প অতি দ্রুত প্রসার লাভ করেছে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে মানুষের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছে। ১৯৭৯ সালের ইসলামিক বিপ্লব-পরবর্তী সময়ে ইরানি চলচ্চিত্র যে লক্ষ্য, উদ্দেশ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল তা মানুষের অন্তরে দ্রুত প্রোথিত হয়েছে। সর্বশেষ দশকে ইরানের বেশ কিছু চলচ্চিত্র অস্কার আর কানের মতো আন্তর্জাতিক ও জনপ্রিয় চলচ্চিত্র উৎসবগুলোতে পুরস্কৃত হয়েছে। এখন পর্যন্ত ইরানি সমাজের যেসব সমস্যা অবলম্বন করে ইরানি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে, তার মধ্যে মাদকের ভয়াবহতা, স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য কলহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, শরণার্থী সমস্যা, দেশে দেশে যুদ্ধবিগ্রহ আর ধর্মীয় উগ্রবাদী কার্যকলাপ, বয়ঃসন্ধিকালের সমস্যা, বেকারত্ব, আর্থিক অভাব-অনটন ও প্রবাস জীবনের ব্যথা-বেদনা ইত্যাদি। এই সমস্যাগুলো বিশ্বের প্রায় প্রতিটি সমাজ, ধর্ম, বর্ণ, সংস্কৃতিভেদে মূলত এক ও অভিন্ন। ইরানি চলচ্চিত্রের দুটি ধারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। একটি হলো ১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লব-পূর্ববর্তী ধারা, যেখানে অধিকাংশ চলচ্চিত্র অতিলৌকিক ঘরানার; অপরটি হচ্ছে বিপ্লব-পরবর্তী ধারা, যেখানে বাস্তব সমস্যাবলিকে অবলম্বন করে চলচ্চিত্র নির্মাণ করার প্রবণতাই প্রধান।

দেশকাল ছাপিয়ে ইরানের সিনেমা এখন বৈশ্বিক পরিসরে অপরিহার্য উপাদান হিসেবে পরিগণিত। জীবনঘনিষ্ঠ বাস্তবতার নিরিখে প্রতিটি সিনেমাই যেন সমগ্র বিশ্বের কথা বলে। নতুন করে ভাবতে শেখায়, কল্পনার জগতকে নতুন করে উন্মোচন করে। সিনেমার জগতকে শুধুই বিনোদন আর নাচ-গানের বাইরে রেখেও যে অব্যক্ত কথা বলা যায়; দুঃখ-বেদনা, আশা-নিরাশা, বিষণ্নতা-নির্জনতা, প্রেম-ভালোবাসার অনুচ্চারিত শব্দগুলো দর্শকদের সামনে মেলে ধরা যায়, তার বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে বিশ্বখ্যাত ইরানি পরিচালক দারিয়ুশ মেহেরজুই, আব্বাস কিয়ারোস্তামি, মহসিন মখমলবাফ, মাজিদ মাজিদি, আসগর ফারহাদি, বাহমান কোবাদি'র চলচ্চিত্র। নতুন যুগের ও নতুন ঘরানার পরিচালকগণও পিছিয়ে নেই; যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ইরানি চলচ্চিত্রকে নতুনত্ব দান করছেন। হরেকরকম বিষয়বস্তুর সমাহার ঘটিয়েছেন তাঁরা। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে ইরানি সিনেমা প্রচার ও প্রসারের দুই যুগের বেশি সময় অতিক্রান্ত হচ্ছে। রঙিন দুনিয়ার প্রদর্শনী আর প্রচার ছাড়িয়ে স্থান করে নিচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাঠ্যক্রমে।

শুদ্ধ, পরিশীলিত ও মৌলিক গল্পনির্ভর চলচ্চিত্র হিসেবে ইরানি চলচ্চিত্র বিশ্বব্যাপী আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে। সমসাময়িক নানা বাস্তবচিত্র ইরানি চলচ্চিত্রের মূল উপাদান। বাস্তব জীবনের

মুখোমুখি সমস্যার ওপর ভিত্তি করে সহজ-সরল ঢঙে নির্মিত তাদের চলচ্চিত্রগুলো পারস্য ভাষা-সাহিত্য-সভ্যতা-সংস্কৃতির বিজ্ঞাপন হিসেবে বিশ্বদরবারে সমাদৃত। তাই বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ইরানি চলচ্চিত্র এখনো অসংখ্য চলচ্চিত্রবোদ্ধার নিকট অবাক করা বিষয়। যাবতীয় রূপকথা, অকল্পনীয় বিষয়, অহেতুক মারদাঙ্গা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও অলৌকিক-অবিশ্বাস্য গল্পের প্রথাগত বৃত্তের বাইরে এসে কীভাবে ইরানি চলচ্চিত্রাঙ্গন নিজেকেই ছাড়িয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত– তা চলচ্চিত্রবোদ্ধাদের নিকট এক বিস্ময়কর ভাবনার খোরাক। এছাড়া ইরানের মতো একটি ভূখণ্ড, যেখানে প্রাচীনকাল থেকেই ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে জনমনে গ্রথিত, সেখানে চলচ্চিত্রের মতো একটি শিল্প এতটা শক্ত স্থান অর্জন করল কী করে, এও এক আশ্চর্যের ব্যাপার!

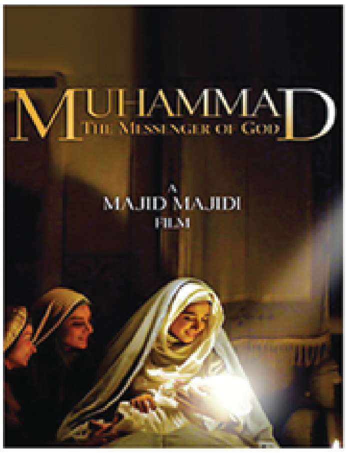

ইরানি জনগণের শৈল্পিক রুচিবোধ প্রাক-ইসলাম যুগ থেকেই সুবিদিত। পাহাড়ের গায়ে ছাপচিত্র বা খোদাই করা বিভিন্ন জীবজন্তুর অপূর্ব চিত্র ও রাজা-বাদশাহদের দরবারে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের আগমনের সচিত্র বর্ণনা দেখে সহজেই অনুমান করা যায়, ইরানি চলচ্চিত্রের উপাদান কতটা গভীরে প্রোথিত। ল্যুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয়ের সিনেমাটোগ্রাফ আবিষ্কারের ৫ বছরের মাথায় ইরানের তাবরিজ শহরে সিনেমা হল স্থাপন সেই গভীরতার স্বীকৃতি দেয়। পরবর্তীকালে প্রথম চলচ্চিত্র থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে অন্যান্য চলচ্চিত্রে ইরানের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সভ্যতা, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বৈচিত্র্যময় কার্যাবলি সবকিছুই উঠে এসেছে সুনিপুণভাবে।

ইরানের চলচ্চিত্র নিয়ে যাঁরা কমবেশি গবেষণা করেছেন তাঁরা সবাই জানেন যে, মোজাফফার উদ্দিন শাহ (জন্ম ১৮৫৩ – মৃত্যু ১৯০৭ খ্রি.) ১৯০০ সালের ১২ এপ্রিল প্রথম ফ্রান্স ভ্রমণে সিনেমার সঙ্গে পরিচিত হন। মোজাফফার উদ্দিন শাহের ইরানে সিনেমা নিয়ে আসার কারণ শুধু দেশের খেদমত নয়; উপরন্তু নতুন কিছু বৈচিত্র্যময় জিনিস সংযোজনও উদ্দেশ্য ছিল।

১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবের পর অনেকের মনে আশঙ্কা ছিল যে, আসলেই সিনেমা থাকবে কিনা? কিন্তু বিপ্লবের নেতা আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেইনী তাঁর ইরান প্রবেশের প্রথম দিনের বক্তৃতায় সিনেমা সম্পর্কে কথা বলেন এবং সিনেমা নিয়ে দ্বিধা-সংশয়, ভয়-আশঙ্কার কবর দিয়ে ফেলেন। ইমাম খোমেইনী প্রথমেই তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'আমরা ওই ধরনের সিনেমার পুরোপুরি বিরোধী যেখানে আমাদের যুব সমাজকে ধ্বংসের এবং ইসলামি সংস্কৃতি ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য কাজ করে। কিন্তু যদি এমন সিনেমা নির্মাণ হয় যার মধ্যে চরিত্র গঠন ও আমাদের সামাজিক চরিত্র তৈরি করার উপাদান থাকে, তবে আমরা অবশ্যই সেগুলোর সঙ্গে সহমত পোষণ করব।' ইমাম খোমেইনীর বক্তব্যে আরও বেশ কিছু বিষয় উঠে আসে। যেমন, তিনি চলচ্চিত্র পরিচালকদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আপনারা আমার নিকট এমন সিনেমা নিয়ে আসুন, যে সিনেমার মধ্যে চরিত্র গঠনের বিষয়বস্তু থাকবে এবং সেটি মানুষের মধ্যে জ্ঞানের আলো জ্বালাবে। তখন যদি কেউ আপনাদের সঙ্গে বিরোধিতা করে, আমাকে অবগত করবেন।'

এরপর তিনি ইরানের সিনেমা ইতিহাসখ্যাত নন্দিত পরিচালক দারিয়ুশ মেহেরজুইয়ের 'দ্যা কাউ' সিনেমাটির কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এটি অসাধারণ একটি সিনেমা যেখানে একজন চলচ্চিত্র পরিচালক মানুষের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির বেশ কিছু বিষয় তুলে ধরেছেন। এছাড়া তিনি ওই সময়ের একজন পরিচালকের কথা বলেন, যাঁকে সত্য ও তথ্যনির্ভর সিনেমা নির্মাণের জন্য আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং সিনেমা পরিচালনার জন্য কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁকে ক্ষমা করে দেন। এভাবেই সিনেমা সংক্রান্ত সকল জল্পনা-কল্পনার সমাপ্তি ঘটে।

ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে ইরান-বাংলাদেশ সম্পর্কের নানা বৈচিত্র্যময় দিক ঘুরে এখন যুক্ত হয়েছে চলচ্চিত্র মাধ্যমে। যদিও এ ভূখণ্ডে চলচ্চিত্রের যাত্রা শুরু হয়েছিল ইরানের বেশ আগেই, কিন্তু সময় আর বাস্তবতার সঙ্গে সম্ভবত তাল মিলিয়ে উঠতে পারেননি আমাদের দেশের চলচ্চিত্রকাররা। হয়তো পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা বা আর্থিক অসঙ্গতিও একটি বড় কারণ হতে পারে। নব্বইয়ের দশক থেকে এ দেশে ইরানের চলচ্চিত্র জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করে। বাংলাদেশ টেলিভিশন, বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসব, ঢাকাস্থ ইরান দূতাবাসের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ইরানি চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ধারাবাহিকের বিপুল জনপ্রিয়তা তৈরি ও প্রসারে কাজ করেছে। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইরানের বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র নিয়ে পাঠদান, আলোচনা, সেমিনার পাঠকমনে কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। শ্রেণিকক্ষে সেসব চলচ্চিত্র-সংক্রান্ত তথ্যের অপ্রতুলতা, স্বল্পসংখ্যক ইংরেজি বই, ইরানি চলচ্চিত্র-সংক্রান্ত বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বইগুলোতে শুধু ইংরেজি ও ইন্টারনেটনির্ভর তথ্য-উপাত্তের ব্যবহার, চলচ্চিত্রগুলোর ইংরেজি সাবটাইটেল না থাকা, ইরানের নিজস্ব ওয়েব চ্যানেল অ্যাপারাত (aparat) এ দেশের মানুষের কাছে সহজলভ্য না হওয়া প্রভৃতি বিষয় ইরানি চলচ্চিত্রের বিশাল জগৎ থেকে পাঠক ও দর্শককে দূরে সরিয়ে রেখেছে।

লেখক : ইরানি চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ ও অনুবাদক

# ঢাকায় 'পয়েট্রি ফর ফিলিস্তিন' শীর্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ঢাকাস্থ ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও জাতীয় কবিতা মঞ্চের উদ্যোগে গত ২৬ অক্টোবর, ২০২৪, শনিবার বিকেলে ঢাকায় 'পয়েট্রি ফর ফিলিস্তিন' শীর্ষক এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট অডিটোরিয়ামে আয়োজিত দুই পর্বের অনুষ্ঠানটির আলোচনা পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. শাহ্ কাওসার মুস্তাফা আবুলউলায়ী ও বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মজিবুর রহমান মঞ্জু। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকাস্থ ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কালচারাল কাউন্সেলর সাইয়্যেদ রেজা মীরমোহাম্মদী।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেজর জেনারেল সিদ্দিকুর রহমান। ঢাকাস্থ ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের জনসংযোগ বিভাগের পরিচালক মো. সাইদুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জাতীয় কবিতা মঞ্চের সভাপতি কবি মাহমুদুল হাসান নিজামী।

অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন বলেন, ফিলিস্তিন হলো মুসলমানদের পুণ্যভূমি। এখানে মুসলমানদের প্রথম কেবলা আল আকসা অবস্থিত। অথচ মুসলমানদের এই পুণ্যভূমিতেই আজ গণহত্যা চলছে আর আন্তর্জাতিক সমাজ নীরব ভূমিকা পালন করছে। দখলদার ইহুদিবাদী ইসরাইলি সেনাদের অব্যাহত বর্বর হামলায় হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে। তাদের এই পাশবিক হামলা থেকে ফিলিস্তিনের অসহায় নারী, শিশু ও বৃদ্ধরাও রেহায় পাচ্ছে না। তিনি বলেন, ইসলামের শিক্ষা হলো প্রত্যেক মুসলমানের বিপদে এগিয়ে আসা, সহমর্মিতা প্রকাশ করা। তিনি বলেন, ফিলিস্তিন ইস্যুতে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এটা ইসলামের চেতনা। আমরা যদি এ চেতনাকে ধারণ করে ঐক্যের রশিকে শক্ত করে ধরি তাহলে ফিলিস্তিনের মুক্তি আসবেই।

ঢাকাস্থ ইরান দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সেলর সাইয়্যেদ রেজা মীরমোহাম্মদী বলেন, 'পয়েট্রি ফর ফিলিস্তিন' শীর্ষক সম্মেলনের এই আয়োজন ফিলিস্তিনের নিপীড়িত ও নির্যাতিত জনগণের সমর্থনে সাংস্কৃতিক ও শৈল্পিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে একটি প্রভাবশালী পদক্ষেপ। তিনি সম্মেলনে উপস্থিত কবি-সাহিত্যিকদেরকে কলমযোদ্ধা হিসেবে অভিহিত করে বলেন, ফিলিস্তিনের অসহায় ও নির্যাতিত মানুষের প্রতি সমর্থন ও জবরদখলদার ইহুদীবাদী ইসরাইলের অপরাধযজ্ঞের নিন্দায় আপনাদের কলম ও লেখনি আগের চেয়ে আরো বেশি

শক্তিশালী হবে বলে আমার বিশ্বাস।

তিনি গাজা ও দক্ষিণ লেবাননে নারী ও শিশু হত্যা, হাসপাতাল, স্কুল, মসজিদ ও আবাসিক বাড়িতে বোমা হামলাকে গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের স্পষ্ট উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেন এবং একে ইহুদিবাদী শাসকগোষ্ঠীর নজিরবিহীন অপরাধ

বলে অভিহিত করেন।

সাইয়্যেদ রেজা মীরমোহাম্মদী বলেন, ফিলিস্তিন সমস্য কেবল ইসলামি বিশ্বের সমস্যা নয়, এটি সারা বিশ্বের প্রতিটি ধর্ম ও পেশার মানুষের সমস্যা। এ কারণে সারা বিশ্বের মানুষ এমনকি ইউরোপ-আমেরিকার শহরগুলোতেও ফিলিস্তিনি জনগণের সমর্থনে এবং ইহুদিবাদীদের অপরাধের নিন্দা জানিয়ে রাস্তায় নেমে এসেছে।

তিনি বলেন, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান তার ইসলামি ও মানবিক দায়িত্ব ও কর্তব্য অনুযায়ী ফিলিস্তিন ও দক্ষিণ লেবাননের নির্যাতিত জনগণের পাশে আছে এবং তাদের ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলনকে সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে সহযোগিতা করে যাবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. শাহ্ কাওসার মুস্তাফা আবুলউলায়ী বলেন, বাংলাদেশের মানুষের ফিলিস্তিনের প্রতি যে ভালোবাসা আছে তার প্রকাশ ঘটেছে আজকের এই অনুষ্ঠানের কবিদের কবিতার মধ্য দিয়ে। হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়া, হিযবুল্লাহ মহাসচিব সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহসহ সকল শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন, ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমিকে রক্ষার আন্দোলনে যাঁরা জীবন দিচ্ছেন তাঁরা ইসলামের পথে শহিদ হচ্ছেন। শহিদদের রক্ত বৃথা যেতে পারে না। তিনি বলেন, মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে সততা, ন্যায়, নৈতিকতা ও সাহসিকতার ঘাটতির কারণেই আজ ইসলামি বিশ্বে সঙ্কট বিরাজ করছে। ফিলিস্তিনের নিরপরাধ মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে। মুসলমানরা যদি ন্যায়ের পথে ও ঐক্যের পথে ফিরে আসে তাহলে মুসলমানদের জয় আসবেই। তিনি বলেন, আমরা মুসলমানরা কাউকে জুলুম করব না এবং কাউকে জুলুমের শিকার হতে দেব না। ইসলাম একটি চেতনার নাম। এই চেতনা যথাযথভাবে ফিরে আসলেই কেবল ফিলিস্তিনকে মুক্ত করা সম্ভব হবে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মজিবুর রহমান মঞ্জু বলেন, বিশ্বের প্রতিটি মানুষেরেই নিরাপদে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে বলে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো আওয়াজ তুললেও যেন ফিলিস্তিনের মানুষের নিরাপদে বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই। তাদের স্বাভাবিক মৃত্যুর কোনা গ্যারান্টি নেই। শিশুকাল থেকেই ফিলিস্তিনের মানুষ যুদ্ধের মধ্যে বড় হচ্ছে। ফিলিস্তিনকে মুক্ত করতে চাইলে বিশ্ববিবেককে জাগ্রত করতে হবে।

অনুষ্ঠানে রাজউক চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল সিদ্দিকুর রহমান বলেন, মুসলমানদের পূণ্যভূমি ফিলিস্তিন আজ রক্তে রঞ্জিত। দখলদার ইহুদিবাদী ইসরাইলী সেনাদের অব্যাহত বর্বর হামলায় গত এক বছরে ফিলিস্তিনের প্রায় অর্ধলক্ষ নিরপরাধ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। তাদের এই পাশবিক হামলা থেকে ফিলিস্তিনের অসহায় নারী, শিশু ও বৃদ্ধরাও রেহায় পাচ্ছে না। তিনি এ হামলার তীব্র নিন্দা জানান এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে জাতীয় কবিতা মঞ্চের সভাপতি কবি মাহমুদুল হাসান নিজামী বলেন, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান এমন একটি দেশ যে দেশটি ফিলিস্তিনের ব্যাপারে সবসময় সোচ্চার ভূমিকা পালন

করেছে। ফিলিস্তিনের জনগণের জন্য অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য সহযোগিতা করে চলেছে। ইরানের এই ভূমিকা প্রশংসনীয়। আমরা একে অকুণ্ঠ সমর্থন জানাই।

অনুষ্ঠানে ফিলিস্তিনের উপর কবিতা আবৃত্তি ও গান পরিবেশন করা হয়।

# ঢাকায় পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) ও ঐক্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

## উম্মাহর কল্যাণে মুসলমানদের ঐক্যের বিকল্প নেই : ধর্ম উপদেষ্টা

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) ও ইসলামি ঐক্য সপ্তাহ (১২-১৭ রবিউল আউয়াল) উপলক্ষ্যে ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪, শনিবার বিকেলে রাজধানী ঢাকায় এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকাস্থ ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্যোগে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল অডিটোরিয়ামে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত মানসুর চাভোশি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান ও সাবেক জেলা দায়েরা জজ আলহাজ মো. ইসমাইল মিয়া। ঢাকাস্থ ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কালচারাল কাউন্সেলর সাইয়্যেদ রেজা মীর মোহাম্মদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ইমাম সমিতির সভাপতি মাওলানা লুৎফর রহমান। ঢাকাস্থ ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের জনসংযোগ বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে নাতে রাসুল পরিবেশন করেন শিল্পী শাহনাওয়াজ তাবিব। অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন দেশের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ক্বারী আহমদ বিন ইউসুফ আল আজহারী।

অনুষ্ঠানে ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন বলেছেন, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। উম্মাহর কল্যাণে মুসলমানদের ঐক্যের বিকল্প নেই। তিনি বলেন, মুসলিম উম্মাহ যদি একত্রিত হতে পারে তাহলে নতুন পৃথিবী উপহার দিতে পারবে। ইসরাইলের আগ্রাসন থেকে আল-আকসা উদ্ধার করতে সমর্থ হবে। মুসলিম বিশ্বে আমাদের সম্পদের প্রাচুর্য রয়েছে। আমরা যদি এই সমস্ত সম্পদ বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যবহার করতে পারি তাহলে মুসলিম বিশ্ব নতুন শক্তি নিয়ে জেগে উঠবে।

ধর্ম উপদেষ্টা আরো বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন আল্লাহ রহমতস্বরূপ। তিনি ছিলেন মানবতার ও সমগ্র বিশ্বের নবী। তিনিই প্রথম মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার প্রায় এক হাজার ৪০০ বছর পূর্বেই তিনি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর আগমনের পূর্বে পৃথিবীতে মানুষের অধিকার বলতে কিছু ছিল না। মহানবী (সা.) সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন, আরবের উপর অনারবের কিংবা

অনারবের উপর আরবের, সাদার উপর কালোর কিংবা কালোর উপর সাদার বিশেষ কোনো মর্যাদা নেই। পৃথিবীর সব মানুষ সমান এবং আল্লাহ ভীতিই একমাত্র শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড।

ধর্ম উপদেষ্টা আরো বলেন, মহানবী (সা.)-এর আগমনের পূর্বে নারীদের কোনো সম্মান ও মর্যাদা ছিল না, বরং তাদেরকে সকল অনিষ্টের মূল হিসেবে বিবেচনা করা হতো। কিন্তু রাসূল (সা.) ঘোষণা করলেন, মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত। তাঁর এ ঘোষণার মধ্য দিয়ে বিশ্বে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া, নবী করিম (সা.) পৃথিবীতে প্রথম যুদ্ধনীতি ঘোষণা করে বলেন, যুদ্ধের ময়দানে নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করা যাবে না এবং মন্দির, গির্জা ও প্যাগোডাতে ধর্মযাজকদেরকে হত্যা করা যাবে না।

উপদেষ্টা বলেন, মহানবী (সা.) যেটা বলেছেন সেটা বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। এর ব্যতিক্রম কখনো ঘটেনি। তিনি সমগ্র জীবনে তত্ত্বকে বাস্তবে রূপায়ণ করেছেন। আমরা যদি রাসূল (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণ করতে পারি তাহলে আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন আলোকিত ও মহিমান্বিত হবে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রদূত মানসুর চাভোশি বলেন, মহান আল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে সারা বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাসূল (সা.)-কে 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ রাসূল (সা.) হলেন সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত পূর্ণাঙ্গ রহমতস্বরূপ, যার মধ্য দিয়ে আল্লাহ তাঁর এই রহমত তাঁর সৃষ্ট প্রতিটি জীবের মধ্যে পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি বলেন, কোনো বিশেষ জাতি বা যুগ নয়, বরং রাসুলের মাধ্যমে প্রেরিত এই রহমতের ধারা কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতির জন্য বহমান থাকবে। রাষ্ট্রদূত বলেন, মহানবী (সা.) ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। তাঁর চারিত্রিক মাধুর্যে মূর্তিপূজারিরাও আকৃষ্ট হয়েছে এবং তিনি বিধর্মী কাফের, মুশরিক ও মুর্তিপূজারিদেরকে ইসলামের পতাকাতলে আবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আজকে মুসলিম বিশ্বে যেসব বিভেদ রয়েছে তা দূর করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই রাসূলের পথ অনুসরণ করতে হবে এবং তাঁর নির্দেশ মেনে চলতে হবে । রাসূল (সা.) সবসময় মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ থাকার উপর গুরুত্ব দিতেন। আল্লাহর বাণীর কথাই তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন, 'তোমরা ঐক্যের রশিকে শক্ত করে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। বিশ্বের মুসলমানরা যদি মহানবী (সা.)-এর এই বাণী অনুসরণ করে এবং নিজেদের মধ্যকার বিভেদ ভুলে ঐক্যের বন্ধন সুদৃঢ় করে তবেই বর্তমান মুসলিম বিশ্বের সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব।

অনুষ্ঠানে ঢাকাস্থ ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কালচারাল কাউন্সেলর

সাইয়্যেদ রেজা মীরমোহাম্মদী বলেন, ইসলামি ঐক্য শুধু একটি স্লোগান নয়; বরং কুরআনের একটি নির্দেশ। পবিত্র কুরআনের বেশ কয়েকটি আয়াতে এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার যে নির্দেশনা রয়েছে তা অনুসরণ করতে চাইলে মুসলমানদেরকে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তিনি বলেন, ফিলিস্তিন ইস্যু এবং এই ইসলামি ভূখণ্ডের অধিবাসীদের বিশেষ করে গাজা উপত্যকার মানুষের দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক পরিস্থিতি আজ ইসলামি বিশ্ব ও মুসলমানদের প্রথম ও প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বের সকল মুসলিম জাতি ও ইসলামি সরকারগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়া কয়েক দশকের এই সংকট নিরসন করা কঠিন।

সাইয়্যেদ মীরমোহাম্মাদী বলেন, ইতিহাসের এই সংকটময় মুহূর্তে ফিলিস্তিনিদের ও ইসলামি বিশ্বের এই ভূখণ্ডে দখলদার ইহুদিবাদী কর্তৃক মর্মান্তিক গণহত্যা অভিযান ইসলামি ঐক্যের উপর জোর দেওয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে দ্বিগুণ করেছে। আশা করা যায় যে, সমস্ত ইসলামি দেশ ও জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে ইহুদিবাদীদের উপর চাপ সৃষ্টি করবে যাতে মুসলমানদের উপর ইসরাইলের দশকের পর দশক ধরে চলা বর্বর অত্যাচার ও নির্যাতনের অবসান ঘটে এবং মুসলমানরা তাদের প্রথম কেবলা আল-আকসা মসজিদে ঐক্যের কাতারে ঐতিহাসিক জামায়াতে নামাজ আদায় করতে পারে।

অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান বলেন, আইয়ামে জাহেলিয়ার যুগে মানবতা যখন বিপন্ন হয়ে পড়েছিল তখন মহান আল্লাহ তায়ালা মক্কার কুরাইশ বংশে মানবতার মুক্তির দূত হিসেবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে প্রেরণ করেছেন। যিনি এই অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীর মানুষকে মুক্তির দিশা দেখিয়েছিলেন। মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি বলেন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইসলাম ধর্মের মূল কাণ্ডারি হিসেবে সবার জন্য যেসব পরামর্শ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়ে গেছেন তাতে তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ করাই ইসলামি উম্মাহর ঐতিহাসিক ও অগ্রসরমাণ পথ চলার মূল কথা যা মুসলমানদের মধ্যকার সকল বিভেদ ও বিভাজনকে দূর করে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম।

অনুষ্ঠানে সাবেক জেলা দায়েরা জজ আলহাজ মো. ইসমাইল মিয়া তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই ফারসি ও উর্দু ভাষার দুটি কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে রাসূলের উচ্চ মর্যাদা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) ছিলেন সর্বোত্তম চারিত্রিক ও মানবীয় গুণাবলির অধিকারী। তাঁর জীবনাদর্শ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আদর্শ। তাঁকে যেভাবে মর্যাদা দেওয়া দরকার আমরা যদি তাঁকে সেই মর্যাদা দিই এবং তাঁর জীবনাদর্শকে সঠিকভাবে মেনে চলি তাহলে বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব থাকতে পারে না।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ইমাম সমিতির সভাপতি মাওলানা লুৎফর রহমান বলেন, পৃথিবীর সমস্ত দ্বীনের উপর শান্তির ধর্ম ইসলামকে বিজয়ী করতেই মহান আল্লাহ আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। আমরা যদি মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর জীবনী ও তাঁর আদর্শকে ধারণ করে ঐক্যবদ্ধ হতে পারি তাহলেই একটি সুন্দর সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সবসময় ঐক্যের উপর গুরুত্ব দিতেন। কাজেই বিশ্বের মুসলমানরা যদি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শ ও দিকনির্দেশনা অনুসরণ করে নিজেদের মধ্যকার সকল মতবিরোধ দূর করে ঐক্যবদ্ধ হয় তাহলেই কেবল মুসলিম বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে ইরানের বিরুদ্ধে অনেক অপপ্রচারণা রয়েছে। তবে আমি ইরান সফর করেছি এবং দেখেছি দেশটির বিভিন্ন মাযহাবের অনুসারীদের মধ্যে কোনো বিভেদ নেই। তারা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করছে। যা অন্য মুসলিম দেশের জন্য মডেল হতে পারে। তিনি ইরানের মুসলিম জাতির একতার প্রশংসা করে বলেন, ইরানে ইসলামের সকল মাযহাবের অনুসারীরা যদি নিজেদের মধ্যকার সকল বিভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত হতে পারে তাহলে আমি মনে করি এটা বাংলাদেশেও সম্ভব।

# ঢাকায় 'হাফিজের প্রেরণায় নজরুল' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গত ১৯ অক্টোবর, ২০২৪, শনিবার, ঢাকাস্থ ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের মিলনায়তনে 'হাফিজের প্রেরণায় নজরুল' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাসের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও বাংলাদেশ নজরুল আবৃত্তি পরিষদের যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরেণ্য শিক্ষাবিদ ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য প্রফেসর ড. শমসের আলী। এতে সভাপতিত্ব করেন ইরান দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সেলর জনাব সাইয়্যেদ রেজা মীরমোহাম্মদী। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট কবি আল মুজাহিদী, সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. আবদুস সবুর খান, লালমাটিয়া সরকারি মহিলা কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক সায়লা আহমেদ এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি সেক্রেটারি জনাব জেহাদ উদ্দিন।

প্রফেসর ড. শমসের আলী তাঁর বক্তব্যে বলেন, আমি বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও সাহিত্যের প্রতি আমার খুব আগ্রহ ছিল। বিশেষ করে বাংলা, ইংরেজি ও ফারসি সাহিত্য বিষয়ে। ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহ্য রয়েছে প্রায় ৩ হাজার বছরের। কবি ওমর খৈয়াম, শেখ সাদি, হাফিজ, ফেরদৌসী হলেন পারস্যের ঐতিহ্য, প্রকৃতপক্ষে তাঁরা পৃথিবীরই ঐতিহ্য। কাজী নজরুল ইসলাম হাফিজ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তিনি ১৯১৭ সালে গজল লিখেছিলেন। তিনি বলেন, হাফিজ তাঁর গজলে যেমন প্রেমের কথা বিভিন্নভাবে উল্লেখ করেছেন, তেমনি নজরুলও করেছেন। নজরুল তাঁর কবিতায় বলেছেন, একমাত্র ভালোবাসাই পারে পৃথিবীর বুক থেকে সব অত্যাচারকে দূর করতে।

অনুষ্ঠানে ঢাকাস্থ ইরান দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সেলর সাইয়্যেদ রেজা মীরমোহাম্মদী বাংলাদেশসহ গোটা ভারতীয় উপমহাদেশে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাবের কথা উল্লেখ করে বলেন, মহাকবি হাফিজের মতো ইরানের বিখ্যাত কবি সাহিত্যিকদের দ্বারা এদেশের সাহিত্যপ্রেমীরা দারুণভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছে। আমরা বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যকর্মেও ফারসি সাহিত্যের প্রভাব লক্ষ্য করেছি। তিনি ইরানের মহাকবি হাফিজের বেশকিছু গজল বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কবি নজরুল ফারসি সাহিত্যকে কতটুকু হৃদয়ে ধারণ করেছেন। তিনি বলেন, কবি হাফিজের সাহিত্যকর্ম কেবল ইরানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তাঁর সাহিত্যকর্মের প্রভাব বিশ্বময়। তিনি বহুকাল আগে সাহিত্য রচনা করে গেলেও এখনও তা আধুনিক বলে মনে হয়। ফিলিস্তিন প্রসঙ্গে কবি হাফিজের একটি গজল উদ্ধৃত করে বলেন, কবি হাফিজ তাঁর 'দিওয়ান'-এ প্রেম ও এরফানের দীর্ঘ ও কঠিন পথের অবসানকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাথে সংযুক্ত করেছেন। যেকোনো কঠিন পথে প্রেম এবং ঐশী জ্ঞানের অন্বেষণকারীকে তার প্রতিকূলতা এবং বিপদের বিরুদ্ধে ধৈর্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণের আহ্বান জানিয়েছেন এবং তাকে আশাবাদী হতে বলেছেন।

সাইয়্যেদ রেজা মীরমোহাম্মদী ফিলিস্তিনে জবর দখলদার ইহুদিবাদী ইসরাইলের বর্বর আগ্রাসনের কথা উল্লেখ করে বলেন, কবি হাফিজের 'হারিয়ে যাওয়া ইউসুফ' শীর্ষক গজলের সাথে ফিলিস্তিনের বর্তমান ঘটনাবলি যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এই গজলটির কথা থেকে মনে হয় যেন এটি ফিলিস্তিনের নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষদের নিয়েই লেখা হয়েছে।

কবি হাফিজের এই গজলের শেষ লাইনে বলা হয়েছে, যারা যেকোনো কঠিন বিপদে ধৈর্য ধারণ করে, পবিত্র কুরআনকে অনুসরণ করে এবং মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে সত্যের পথে কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলায় অবিচল থাকে তাদেরকে আশাবাদী

হতে বলা হয়েছে। কারণ, বিজয় তাদের আসবেই। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, ফিলিস্তিনের মুজাহিদরা তাদের ন্যায্য অধিকারের জন্য অর্থাৎ হকের পক্ষে যেভাবে লড়াই করছে, জীবন বিলিয়ে দিচ্ছে, তাদের এই ত্যাগ বৃথা যেতে পারে না। বিজয় তাদের আসবেই।

কবি আল-মুজাহিদী বলেন, কাজী নজরুল ইসলাম হলেন বিদ্রোহী কবি। তাঁর ভাষা বাংলা বিশ্বের প্রাচীনতম ভাষার একটি। একইভাবে হাফিজের মাতৃভাষা ফারসি ভাষাও প্রাচীনতম ও সভ্য ভাষার অন্যতম। এই দুই ভাষার মিল অনুপ্রেরণাদায়ক। কাজী নজরুল ইসলাম হাফিজ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর ইরান সফরের অভিজ্ঞতা থেকে বলেন : আমি ইমাম খোমেইনী (রহ.)-এর দৃষ্টিতে বিশ্বের রাজনীতি দেখেছি। মধ্যপ্রাচ্যের শোচনীয় পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে তিনি ইসলামি বিশ্বের ঐক্যের উপর জোর দেন। তিনি বলেন, এ বিষয়ে ইরান ও বাংলাদেশ একসঙ্গে কাজ করছে বলে আমার বিশ্বাস। বিশ্বের সর্বত্র ফ্যাসিবাদ চলছে এবং এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য বিশ্বের ইসলামি উম্মাহর ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই।

অধ্যাপক ড. আবদুস সবুর খান বলেন, নজরুল নিজেই প্রমাণ করেছেন যে, নজরুলের কবিতার প্রেরণা ছিলেন হাফিজ। হাফিজের সাথে কাজী নজরুলের পরিচয় নজরুল বিখ্যাত হয়ে ওঠার অনেক আগেই ঘটেছিল। ১৯১৭ সালে নজরুল একজন পাঞ্জাবি মৌলভির কাছে ফারসি ভাষা শিখেছিলেন। কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'রুবাইয়াতে হাফিজ' বইয়ের শুরুতে তাঁর ফারসি শেখার অভিজ্ঞতা লিখেছেন। নজরুল লিখেছেন, আমি ১৯১৭ সালে বিশ্বযুদ্ধে গিয়েছিলাম, সেখানে আমি হাফিজের সাথে পরিচিত হই। সেই মুহূর্তে আমি হাফিজের 'দিওয়ান' অনুবাদ করতে প্রস্তুত ছিলাম না, কিন্তু কয়েক বছর পরে আমি এটি অনুবাদ করতে শুরু করি।' নজরুলের বন্ধু কমরেড মুজফফর আহমদ জানান, তাঁর ব্যাগে তিনি 'হাফিজের দিওয়ান' বইটি দেখতে পান। নজরুল 'দিওয়ানে হাফিজ' এর ৩০ বা ৩৫টি গজল অনুবাদ করেছেন। ড. সবুর খান বলেন, হাফিজ ও কাজী নজরুল শৈশব, কৈশোর, কবিতা ও রচনার কাঠামো, তাঁদের সাহিত্যকর্ম, এমনকি মৃত্যু ও মৃত্যুর পরের অবস্থা ইত্যাদি দিক থেকে খুবই অনুরূপ। হাফিজ যেমন সৃষ্টিকর্তার ইবাদত করেছেন, কবি নজরুলও সৃষ্টিকর্তায় দৃঢ় বিশ্বাস রেখে বিদ্রোহের গান গেয়েছেন।

অধ্যাপক শায়লা আহমেদ ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সেলরকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, কাজী নজরুল ইসলাম মূলত হাফিজের কবিতা দ্বারা অনুপ্রাণিত। কাজী নজরুল ইসলামের 'হাফিজের রুবাইয়াত' গ্রন্থটি প্রায় ৯৪ বছর আগে প্রকাশিত হয়। নজরুলের আধ্যাত্মিক কবিতা এবং নজরুলের রোমান্টিক কবিতা ইরানি কবিদের দ্বারা অনুপ্রাণিত। তিনি বলেন, আসুন আজকের অনুষ্ঠান উপভোগ করি এবং নজরুল ও হাফিজের কাজের পুনঃমূল্যায়ন করি।

জনাব মোহাম্মদ জিহাদ উদ্দিন বলেন, বিশ্বে হাফিজ ও নজরুলের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের জাতীয় কবি। তাঁর নামের তিনটি গুণ রয়েছে। যিনি বিচারক– ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করেন, নজরুল মানে চোখ ও মতামত, নজরুল ইসলাম মানে ইসলামের মতামত। আমরা কাজী নজরুল ইসলামকে বিভিন্ন নাম দিয়েছি, কিন্তু তিনি নিজেই নিজের নামের সাথে 'খাদিম আল-ইসলাম' উপাধি যোগ করেছেন। কারণ, তিনি নিজে বিশ্বাস করতেন যে, তিনি ইসলামের খাদেম। তিনি এমন এক সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যখন ব্রিটিশ বাহিনী উপমহাদেশে মুসলিম শাসন উৎখাত করতে ব্যস্ত ছিল। নজরুল এমন এক সময়ে আবির্ভূত হন যখন ব্রিটিশরা এদেশে এসে এদেশের মানুষকে তাদের সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিল। কিন্তু কাজী নজরুলের লেখায় এদেশের মানুষ আবার তাদের সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হয়। নজরুল তাঁর শিক্ষার জন্য ইংরেজি স্কুলের দিকে নজর দেননি, তবে তিনি ফারসি কবিদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন।

# ঢাবির ফারসি বিভাগের নবীন বরণ ও বিদায় সংবর্ধনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের নবীন বরণ ও বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (২৭ নভেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) মিলনায়তনে নবীন বরণ অনুষ্ঠিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. মুমিত আল রশিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, বাংলাদেশে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত মানসুর চাভোশী, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান এবং ঢাকাস্থ ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কালচারাল কাউন্সেলর সাইয়্যেদ রেজা মীরমোহাম্মদী বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান স্বাগত বক্তব্য দেন। সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. আহসানুল হাদী অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন। নবীন শিক্ষার্থীদের পক্ষে হৃদয় রায় ও জেরিন আফরোজ এবং বিদায়ী শিক্ষার্থীদের পক্ষে মিতু আক্তার ও মো. খায়রুজ্জামান বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান নবীন শিক্ষার্থীদের আন্তরিক অভিনন্দন ও বিদায়ী শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবনের সাফল্য কামনা করেন। তিনি বলেন, ফারসি ভাষা একটি সমৃদ্ধ ভাষা। এই ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অনন্য ভূমিকা রয়েছে।

ফারসি ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় সহায়তার জন্য তিনি ইরানের রাষ্ট্রদূতকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশ এবং ইরান দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত বন্ধু। ইতিহাস, ঐতিহ্য, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দু'দেশের জনগণের গভীর মেলবন্ধন রয়েছে। দু'দেশের এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ইরানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণের উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে নবীন বরণ ও বিদায় সংবর্ধনা উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করা হয়। এছাড়া ২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষের এমএ শ্রেণিতে সর্বোচ্চ সিজিপিএ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সম্মাননা প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় পর্বে বিভাগের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

# ঢাকার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনদিনব্যাপী ইরানি চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত

রাজধানীর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ৩ থেকে ৫ ডিসেম্বর, ২০২৪ তিনদিনব্যাপী ইরানি চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ৩ ডিসেম্বর সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ রেজাউল করিম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকাস্থ ইসলামি

প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত মানসুর চাভোশী এবং ঢাকাস্থ ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কালচারাল কাউন্সেলর সাইয়্যেদ রেজা মীরমোহাম্মদী। অনুষ্ঠানে  সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. সাবিনা শারমিন এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন বিভাগের শিক্ষক সামির আহমেদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন বিভাগের চেয়ারম্যান ড. শাহ নিস্তার জাহান কবীর।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন বিভাগ ও ফিল্ম ক্লাবের উদ্যোগে এবং ঢাকাস্থ ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সহযোগিতায় আয়োজিত এ উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ রেজাউল করিম বলেন, ইরান ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ একটি দেশ। দেশটির সাথে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। ভাতৃপ্রতিম দেশ দুটির ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে অনেক মিল রয়েছে। তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন বিভাগ ও ফিল্ম ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত তিনদিনব্যাপী ইরানি চলচ্চিত্র উৎসবে ঢাকাস্থ ইরান দূতাবাস ও ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সহযোগিতার প্রশংসা করে বলেন, এ ধরনের আয়োজন দু'পক্ষের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে আরো শক্তিশালী করবে। তিনি বলেন, ইরানের চলচ্চিত্র সারা বিশ্বেই সমাদৃত। ইরানি চলচ্চিত্রের গুণগত মান, সরলতা, নৈতিক শিক্ষা এবং মানবিক বার্তা আমাদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সমাজ, সংস্কৃতি ও মানবিকতার দিকগুলো সম্পর্কে জানা সম্ভব। এ ধরনের উৎসব শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জ্ঞানচর্চার নতুন দ্বার উন্মোচন করবে।

ঢাকাস্থ ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত মানসুর চাভোশি বলেন, চলচ্চিত্র হলো বিশ্বের এমন একটি প্রভাবশালী শিল্প যা বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষকে আরো কাছাকাছি নিয়ে আসে। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে একটি দেশের সমাজ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও মানবিক দিকগুলো সম্পর্কে জানা যায়। ইরানের চলচ্চিত্র শিল্প বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ চলচ্চিত্র শিল্প হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন বিভাগ ও ফিল্ম ক্লাবের উদ্যোগে  ইরানি চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ

জানিয়ে বলেন, এ ধরনের আয়োজন বাংলাদেশ ও ইরানের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করবে।

অনুষ্ঠানে ঢাকাস্থ ইরান দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সেলর সাইয়্যেদ রেজা মীরমোহাম্মদী বলেন, চলচ্চিত্র শিল্প হলো অনেকগুলো শিল্পের সমন্বিত রূপ। এতে রয়েছে গল্প, সংগীত, অভিনয়, সিনেমাটোগ্রাফি ইত্যাদি। এটি কেবল একটি শিল্পই নয়, বরং এটি আজ দর্শকদের কাছে বার্তা পৌঁছে দেওয়ার অন্যতম প্রভাবশালী ও গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যমে পরিণত হয়েছে। এ কারণে ইসলামি বিপ্লবের বিজয়ের পর ইরান তার বিপ্লবের বার্তা এই প্রভাবশালী শিল্পের মাধ্যমে দেশী-বিদেশী দর্শকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

ইরানের কালচারাল কাউন্সেলর বলেন, ইরানি চলচ্চিত্রে গল্প বা বিষয়বস্তুর উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। ইরানি সিনেমার গল্পে মানবিক ও নৈতিক বিষয়গুলো বেশি প্রাধান্য পায়। আর এ কারণেই ইরানি চলচ্চিত্র বিশ্বের দর্শকদের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত হচ্ছে। বাংলাদেশের মানুষের কাছেও ইরানি চলচ্চিত্রের প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। আমরা মনে করি, এ ধরনের চলচ্চিত্র উৎসব দুদেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আরো জোরদারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইরানি চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এ ধরনের সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে আমাদের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমীন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইরানি চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজনে সহযোগিতার জন্য ইরানি দূতাবাসকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ইরানি চলচ্চিত্রে সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক শিক্ষণীয় বিষয়গুলো অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়। আমাদের শিক্ষার্থীরা এসব চলচ্চিত্র থেকে অনেক কিছু শিখতে পারে। ইরানি চলচ্চিত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ততার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও সৃজনশীলতা আরও সমৃদ্ধ হবে।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন বিভাগের চেয়ারম্যান ড. শাহ নিস্তার জাহান কবীর ও বিভাগের শিক্ষক সামির আহমেদ।

তিনদিনব্যপী এই উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেখানো হয় ইবরাহিম হাতামি কিয়া পরিচালিত 'বডিগার্ড'। উৎসবের দ্বিতীয় দিন ৪ ডিসেম্বর দেখানো হয় ইরানের বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা মাজিদ মাজিদির 'দি কালার অব প্যারাডাইস' ও সাইফুল্লাহ দাদ পরিচালিত 'দি সারভাইভার'। উৎসবের শেষ দিন ৫ ডিসেম্বর প্রদর্শিত হয় মাজিদ মাজিদির 'দি সংস অব স্প্যারো', আব্বাস কিয়ারোস্তামির 'টেস্ট অব চেরি' এবং মাজিদ মাজিদির 'দি চিল্ড্রেন অব হ্যাভেন'। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে আয়োজিত এ উৎসব সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল।

## ফুসফুস ক্যান্সারের অ্যান্টিবডি তৈরিতে মোস্তফা শামলুই'র প্রথম স্থান লাভ

ফুসফুস ক্যান্সারের চিকিৎসায় একটি অ্যান্টিবডি তৈরির জন্য সিলিকন ভ্যালি ইন্টারন্যাশনাল ইনভেনশন ফেস্টিভাল (এসভিআইআইএফ) ২০২৪-এ প্রথম স্থান লাভ করেছেন ইরানি উদ্ভাবক মোস্তফা শামলুই। ক্যালিফোর্নিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যান্টিবডি তৈরির জন্য তাঁর প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুমোদন করে। তিনি উৎসবে ১১ সদস্যের একটি দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় উদ্ভাবন প্রদর্শনী। ৪০টি দেশ থেকে উৎসবে অংশ নেওয়া ১ হাজার ২শ জনের মধ্যে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন।

## ইরান শক্তিমত্তা সৃজনের প্রযুক্তিতে বিশ্বের সেরা ১০-এর অন্যতম

মুসলিম বিশ্বের বিজ্ঞান বিষয়ক তথ্য উদ্ধৃতি কেন্দ্রের প্রধান বলেছেন, ইরান শক্তিমত্তা সৃজনের প্রযুক্তিতে বিশ্বের সেরা ১০-এর অন্যতম। ওয়ার্ল্ড সায়েন্স সাইটেশন নামক (আইএসসি) সংস্থাটির প্রধান সাইয়্যেদ আহমাদ ফাজেলজাদেহ এ তথ্য জানিয়েছেন। ইরান বৈজ্ঞানিক উৎপাদনে ২০২৪ সালে বিশ্বের শীর্ষ ২০টি দেশের মধ্যে ১৭তম স্থানে রয়েছে এবং মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে।

# নিউজ লেটার

৪৫তম বর্ষ: ২য় সংখ্যা

আগস্ট-ডিসেম্বর, ২০২৪ ইং | সফর-রবিউস সানি ১৪৪৬ হিজরি

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) ও ইসলামি ঐক্য সপ্তাহ (১২-১৭ রবিউল আউয়াল) উপলক্ষ্যে ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪, শনিবার বিকেলে ঢাকাস্থ ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্যোগে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল অডিটোরিয়ামে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত মানসুর চাভোশি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান ও সাবেক জেলা দায়েরা জজ আলহাজ মো. ইসমাইল মিয়া। ঢাকাস্থ ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কালচারাল কাউন্সেলর সাইয়্যেদ রেজা মীরমোহাম্মাদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ইমাম সমিতির সভাপতি মাওলানা লুৎফর রহমান।

ঢাকাস্থ ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও জাতীয় কবিতা মঞ্চের উদ্যোগে গত ২৬ অক্টোবর, ২০২৪, শনিবার বিকেলে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট অডিটোরিয়ামে 'পয়েট্রি ফর ফিলিস্তিন' শীর্ষক এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকাস্থ ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কালচারাল কাউন্সেলর সাইয়্যেদ রেজা মীরমোহাম্মাদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. শাহ্ কাওসার মুস্তাফা আবুলউলায়ী ও বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মজিবুর রহমান মঞ্জু।